Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

৭ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারী ২০০৪

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

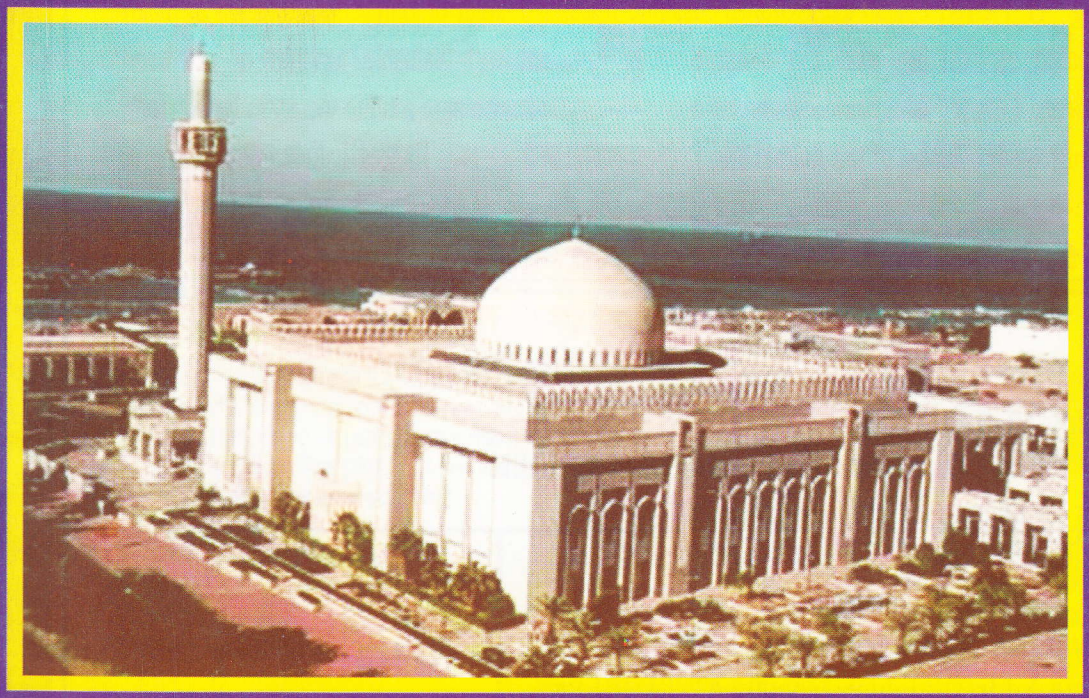

Contents

প্রকাশক ঃ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী।
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ফোনঃ (অনুঃ) ৭৬১৩৭৮, ৭৬১৭৪১
মুদ্রণে ঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোনঃ ৭৭৪৬১২।

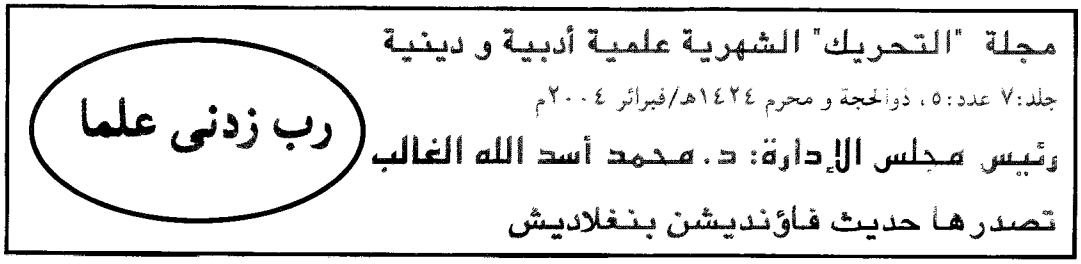

প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ **GRAND MOSQUE**, কুয়েত।

Monthly **AT-TAHREEK** an extra-Ordinary Islamic research Journal of Bangladesh directed to Salafi Path based on real Tawheed and Sahih Sunnah. Enriched with valuable writings of renowned scholars and Columnists of home and abroad, aiming to establishing a pure islamic society in Bangladesh. Some of regular columns of the Journal are: 1. Dars-i- Quran 2. Dars-i- Hadees 3. Research Articles. 4. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 5. Wonder of Science 6. Health, Medicine & Agriculture 7. News : Home & Abroad & Muslim world. 8. Pages for Women 9. Children 10. Poetry 11. Fatawa etc.

Monthly **AT-TAHREEK**
Cheif Editor : Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.
Editor : Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by : Hadees Foundation Bangladesh.
Kajla, Rajshahi, Bangladesh.
Yearly subscription at home Regd. Post. Tk. 170/00 & Tk. 90/00 for six months.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK
NAWDAPARA MADRASAH (Air port Road) P.O. SAPURA, RAJSHAHI.
Ph & Fax : (0721) 760525, Ph : (0721) 761378, 761741.

Contents

মাসিক

بسم الله الرحمن الرحيم

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৭ম বর্ষঃ	৫ম সংখ্যা
যুলহিজ্জাহ-মুহাররম	১৪২৪-১৪২৫ হিঃ
মাঘ-ফাল্গুন	১৪১০ বাং
ফেব্রুয়ারী	২০০৪ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
শামসুল আলম

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ

সম্পাদক, মাসিক **আত-তাহরীক**
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইলঃ ০১৭৫০০২৩৮০
মাদরাসা ও 'আত-তাহরীক' অফিস ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮
সার্কুঃ ম্যানেজার মোবাইলঃ ০১৭১-৯৪৪৯১১
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫।
ই-মেইলঃ tahreek@librabd.net

ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১২ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- প্রবন্ধঃ
  - শিক্ষা ব্যবস্থায় ধসঃ কিছু পরামর্শ ০৩
    -মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
  - ঐ সকল হারাম যেগুলিকে জনগণ হালকা মনে করে, অথচ তা থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব (৭ম কিস্তি) ০৭
    - মূলঃ মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ
    অনুবাদঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক
  - কবরে তিনটি প্রশ্নঃ মতবাদপন্থী কোন মুসলমানের পক্ষে জবাব দান সম্ভব কি? ১৩
    - মুযাফ্ফর বিন মুহসিন
  - আরবী সাহিত্যে প্রভাব বিস্তারে হাদীছের ভূমিকাঃ একটি সমীক্ষা *-নূরুল ইসলাম* ১৭
  - নারী-পুরুষের সৃষ্টি রহস্য *-মাসঊদ আহমাদ* ২১
  - দায়িত্ব *-রফীক আহমাদ* ২৪
  - কুরআনের মত একটি গ্রন্থ রচনার সম্ভাবনা প্রসঙ্গে ৩০
    -এ,কে, মোহম্মদ আলী
- দিশারীঃ ৩১
  - কেন এমন হয়? *-মুহাম্মাদ আতাউর রহমান*
- চিকিৎসা জগৎঃ ৩৩
  - আর্সেনিকঃ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে এর ভূমিকা
    -ডাঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ভূঁইয়া
- ক্ষেত-খামারঃ ৩৪
  সোহরাওয়ার্দী আজ এক আত্মনির্ভরশীল যুবক
- কবিতাঃ ৩৫
- সোনামণিদের পাতাঃ ৩৬
- স্বদেশ-বিদেশ ৩৭
- মুসলিম জাহান ৪২
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪৩
- সংগঠন সংবাদ ৪৪
- জনমত কলাম ৪৭
- প্রশ্নোত্তর ৪৮

Contents

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সম্পাদকীয়

কাদিয়ানী বিতর্ক শেষ করুন

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী 'বাইরের চাপ' এবং সফররত আমেরিকান কংগ্রেসম্যান জোসেফ ক্রাউলীকে খোশ করে হ'লেও কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণার দীর্ঘদিনের গণদাবীর প্রেক্ষিতে সরকার তাদের সকল প্রকাশনা, বিক্রয়, বিতরণ ও সংরক্ষণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে গত ৮ই জানুয়ারী '০৪ এক বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। ঘোষণাটি দ্বীনদার মহলে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। যদিও বিরোধী দলীয় নেত্রীসহ ধর্মনিরপেক্ষ ও বাম মহল থেকে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এসেছে। ঘোষণাটিকে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যুগান্তকারী বলা চলে এজন্য যে, পাকিস্তান আমল থেকে ঢাকায় আসন গেড়ে বসা এই ভ্রান্ত দলটির গায়ে এযাবত কেউ হাত দেয়ার সাহস করেনি। ইতিমধ্যে বহু মুসলমানকে এরা বিপথে নিয়ে গেছে। এ কাজে প্রধান হাতিয়ার হিসাবে তারা ব্যবহার করেছে তাদের অঢেল বিদেশী অর্থ ও চটকদার প্রকাশনা। আর সেফগার্ড হিসাবে ব্যবহার করেছে সরকারের বড় বড় রুই-কাতলাকে। পাকিস্তানের সৃষ্টিলগ্ন থেকে এযাবৎকাল কাদিয়ানীরা সর্বদা সরকারের মধ্যে বা কাছাকাছি থাকতে চেষ্টা করেছে। যাতে সরকারী প্রশাসন সর্বদা তাদের ব্যাপারে নমনীয় থাকে। 'কাফির' হওয়ার কারণে মক্কায় কাদিয়ানীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। সেকারণ ইসলামের নাম নিয়েই তারা মুসলমানদের প্রতারণা করে চলেছে।

<u>কাদিয়ানীরা 'কাফির' কেন?</u> অন্যদের থেকে মুসলমানদের মৌলিক পার্থক্য হ'ল আক্বীদার পার্থক্য। সে আক্বীদা হ'ল কালেমায়ে শাহাদাত। যার প্রথমাংশ হ'ল <u>লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ</u> 'আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই' এবং দ্বিতীয় অংশ হ'ল <u>মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ</u> 'মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল'। তিনি রাসূল মাত্র নন; বরং ১ লক্ষ ২৪ হাযার নবী-রাসূলের মধ্যে তিনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল *(আহযাব ৪০; আহমাদ, মিশকাত হা/৫৭৩৭)*। তাঁর মাধ্যমেই দ্বীন পূর্ণতা লাভ করেছে এবং ইসলাম আল্লাহ মনোনীত একমাত্র মানবধর্ম হিসাবে প্রেরিত হয়েছে *(মায়েদাহ ৩)*। তিনিই সর্বশেষ রাসূল। তাঁর পরে আর কোন নবী আসবে না। তিনি বলেন, 'আমার পরে আমার উম্মতের মধ্যে ৩০ জন মিথ্যা নবীর আবির্ভাব ঘটবে। প্রত্যেকে নিজেকে আল্লাহ্র নবী বলে ধারণা করবে। অথচ আমিই শেষনবী। আমার পরে কোন নবী নেই' *(আবু দাঊদ প্রভৃতি, মিশকাত হা/৫৪০৬)*। তিনি আরও বলেন, 'নবীদের তুলনা একটি পাকা দালানের ন্যায়, যাতে একটি ইটের জায়গা মাত্র খালি ছিল। আমিই সেই ইট এবং আমার মাধ্যমেই নবীদের সিলসিলা শেষ হয়ে গিয়েছে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৭৪৫)*। তিনি বলেন, 'অন্যান্য নবীগণ এসেছিলেন স্ব স্ব গোত্র ও সম্প্রদায়ের জন্য। কিন্তু আমি প্রেরিত হয়েছি সমস্ত সৃষ্টিকুলের জন্য' *(সাবা ২৮; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৭৪৭)*। হাদীছে জিব্রীলে প্রশ্নোত্তর পর্বে 'ইসলাম কি?' এমন এক প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ইসলাম হ'ল এই যে, তুমি সাক্ষ্য দিবে এ বিষয়ে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং সাক্ষ্য দিবে যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২)*। অন্য হাদীছে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমাকে অন্যদের সঙ্গে লড়াইয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অতক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল..' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১২)*। অন্য হাদীছে এসেছে, 'যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্র আনুগত্য করল। যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের অবাধ্যতা করল, সে আল্লাহ্র অবাধ্যতা করল। মুহাম্মাদ হ'লেন লোকদের মধ্যে *(মুমিন ও কাফিরের) পার্থক্যকারী' (বুখারী, মিশকাত হা/১৪৪)*।

বলা বাহুল্য যে, কালেমায়ে শাহাদাতের প্রথমাংশে তাওহীদ তথা আল্লাহ্র একত্ববাদ এবং দ্বিতীয়াংশে রিসালাতে মুহাম্মাদী তথা খতমে নবুওয়াতের স্বীকৃতিদানের মাধ্যমেই একজন মানুষ ইসলামে দাখিল হ'তে পারে, নইলে নয়। তাঁকে শেষনবী হিসাবে বিশ্বাস করার উপরেই নির্ভর করে মুসলিম উম্মাহ্র ঐক্য ও অগ্রগতি। নির্ভর করে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ দ্বীন হওয়া ও কুরআনের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব হওয়া। অতএব মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে শেষনবী মানতে অস্বীকারকারী কিংবা তাতে সন্দেহ পোষণকারী ব্যক্তি নিঃসন্দেহে কাফির ও জাহান্নামী।

কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, নবুঅতের বিপুল মর্যাদায় ঈর্ষান্বিত হয়ে দুনিয়াপূজারী কিছু ব্যক্তি যুগে যুগে নিজেদেরকে নবী হিসাবে দাবী করেছে। রাসূলের জীবন সায়াহ্নে ইয়ামনের আসওয়াদ আনাসী ও ইয়ামামাতে মুসায়লামা কাযযাব এবং রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরপরই নাজদে তুলায়হা আসাদী ও ইরাকে সাজা' নাম্নী জনৈকা মহিলা 'নবী' হবার দাবী করে। প্রথম খলীফা হযরত আবুবকর (রাঃ) এসব ভণ্ডনবীদের সমূলে উৎখাত করেন। অতঃপর প্রায় তেরশো বছর পরে বর্তমান ভারতের পূর্ব পাঞ্জাবের গুরুদাসপুরে যেলার বাটালা মহকুমাধীন 'ক্বাদিয়ান' নামক উপশহরে জন্মগ্রহণকারী মির্যা গোলাম আহমাদ ক্বাদিয়ানী (১৮৩৫-১৯০৮) ১৮৯১ সালের ২২শে জানুয়ারী নিজেকে 'মসীহ ঈসা' ও ১৮৯৪ সালের ১৭ই মার্চ 'ইমাম মাহদী' এবং ১৯০৮ সালের ৫ই মার্চ তারিখে নিজেকে 'নবী' হিসাবে ঘোষণা দেয়। ১৮৮৯ সালের ২৩শে মার্চ তারিখে তার নিজ নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত দলের নাম রাখা হয় 'আহমাদিয়া জামা'আত'। বর্তমানে এরা বলছে, 'আহমাদিয়া মুসলিম জামাত'। বিদেশে এই জামা'আতের প্রধান ঘাঁটি হ'ল লণ্ডনে এবং ইসরাঈলের বন্দর নগরী হাইফাতে। ইসরাঈল রাষ্ট্রের জন্মের পূর্ব থেকেই তারা ঐ কেন্দ্র থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সেবা করত। বাংলাদেশে এদের মূল ঘাঁটি ঢাকার বখশীবাজারে আলিয়া মাদরাসার পাশে। জানা যায়, ঢাকায় তাদের মোট ৭টি উপাসনালয় এবং সারা দেশে মোট ১৩০টি সেন্টার রয়েছে। তাদের বই ও পত্রিকা বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে প্রচার করা হয়। AM টিভি নামের স্যাটেলাইট চ্যানেলের মাধ্যমে তারা কুরআনের বিকৃত ব্যাখ্যা সারা দুনিয়ায় প্রচার করে।

ভারত উপমহাদেশের উপরে চেপে বসা ইংরেজ দখলদারদের বিরুদ্ধে আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরামের নেতৃত্বে পরিচালিত 'জিহাদ আন্দোলন' যখন ব্যাপক সামাজিক রূপ লাভ করে, তখন বৃটিশ যুলুমশাহীর বিরুদ্ধে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক উত্থানকে অংকুরে বিনাশ করার জন্য কুচক্রী ইংরেজদের অন্যতম চক্রান্ত হিসাবে গোলাম আহমাদ ক্বাদিয়ানীকে তাদের দাবার ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহার করা হয় এবং তার মাধ্যমে খতমে নবুওয়াতের আক্বীদায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে মুসলিম ঐক্যে ফাটল ধরানোর এবং তাদের দৃষ্টিকে আপোষে ঝগড়া লাগানোর দিকে ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা চালায়। এজন্য তারা অর্থের বিনিময়ে অনেক মুসলিম বুদ্ধিজীবীকে কাজে লাগায়। বৃটিশের দালাল এই ভণ্ডনবী ঐ সময় ফৎওয়া প্রচার করে যে, 'ইংরেজ শাসন মুসলমানদের জন্য আসমানী রহমত স্বরূপ। ...অতএব তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হারাম'। তিনি বলেন, 'বৃটিশ হুকুমত আমার জন্য তলোয়ার স্বরূপ।...আল্লাহ এই হুকুমতের সাহায্যে ও সমর্থনে ফেরেশতা নাযিল করেন'।

<u>মুবাহালা ও ভণ্ডনবীর মৃত্যুঃ</u> ১৩১০ হিজরীর ১০ই যুলক্বা'দা মোতাবেক ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে পূর্ব পাঞ্জাবের খ্যাতনামা আহলেহাদীছ আলেম মাওলানা আব্দুল হক গযনভী এই ভণ্ডনবীর বিরুদ্ধে 'মুবাহালার'-র ঘোষণা দেন। অন্যদিকে 'ফাতেহে ক্বাদিয়ান' 'শেরে পাঞ্জাব' 'অল ইণ্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্স'-এর সেক্রেটারী মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (১৮৬৮-১৯৪৮) প্রদত্ত চ্যালেঞ্জের পর চ্যালেঞ্জের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে ১৯০৭ সালের ১৫ই এপ্রিলে উক্ত ভণ্ডনবী বাধ্য হয়ে চ্যালেঞ্জ কবুল করে পাল্টা 'মুবাহালা'-র ঘোষণা দেয় এবং বলে যে, 'হে আল্লাহ! তুমি আমার ও ছানাউল্লাহ্র মধ্যে ফায়ছালা করে দাও এবং তোমার দৃষ্টিতে প্রকৃত অশান্তি সৃষ্টিকারী ও মিথ্যুককে সত্যবাদীর জীবদ্দশাতেই দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নাও'।

দু'দু'জন খ্যাতনামা আহলেহাদীছ আলেমের সাথে মুবাহালার ফলশ্রুতি হ'ল এই যে, আল্লাহ পাক এই মিথ্যানবীকে সত্যবাদীদের জীবদ্দশাতেই ন্যাক্কারজনক মৃত্যু দান করেন এবং ১৯০৮ সালের ২৬শে মে সকাল ১০-টায় লাহোরে প্রচণ্ড কলেরায় যখন তার মৃত্যু হয়, তখন তার মুখ দিয়ে পায়খানা বের হচ্ছিল। অতঃপর দাফনের উদ্দেশ্যে কাদিয়ান নিয়ে যাবার পথে লাহোরের আহমাদিয়া বিল্ডিং থেকে রেল স্টেশন পর্যন্ত মির্যার দুর্গন্ধময় লাশের উপরে ইট-পাথর, ময়লা-আবর্জনা, বিষ্ঠা ও পায়খানা এমনভাবে বর্ষিত হয় যে, বিশ্ব ইতিহাসে কোন কাফিরেরও এত লাঞ্ছনা ও অবমাননার খবর পাওয়া যায় না। উল্লেখ্য যে, কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে দেউবন্দ সহ উপমহাদেশের অন্যান্য হানাফী উলামায়ে কেরামের দৃঢ় ভূমিকা ছিল নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। বর্তমানেও দেশের হানাফী ও আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরাম কাদীয়ানীদের 'কাফের' ঘোষণার ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

<u>দেশে দেশে কাদিয়ানীঃ</u> ইহুদী-খৃষ্টান চক্রের লালিত-পালিত মির্যা কাদিয়ানী যে হাদীছে বর্ণিত ৩০ জন মিথ্যা নবীর অন্যতম ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেকারণ হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর মহান নীতির অনুসরণে এ যাবত পৃথিবীর অন্ততঃ ৪০টি মুসলিম দেশে এদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করা হয়েছে। ১৯৭৪ সালে 'রাবেতা'র উদ্যোগে মক্কায় অনুষ্ঠিত ১৪৪টি রাষ্ট্র ও সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং ১৯৮৮ সালে ইরাকে অনুষ্ঠিত 'ওআইসি' সম্মেলনে এদেরকে 'কাফির' ঘোষণা করা হয়। বাংলাদেশে ১৯৮৫ সালে এবং ১৯৯৩ সালে সুপ্রীম কোর্টের দু'টি মামলার রায়ে এদেরকে 'অমুসলিম' হিসাবে গণ্য করা হয়। ১৯৯৭ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারীতে ঢাকার সোবহানবাগ মসজিদে অনুষ্ঠিত বিরাট মুছল্লী সমাবেশে প্রেসিডেন্ট শাহাবুদ্দীনের উপস্থিতিতে মসজিদে নববীর সম্মানিত খত্বীব ডঃ আব্দুর রহমান আল-হোযায়ফী এদেরকে 'কাফির' ঘোষণা করে বলেন, এদেরকে যারা মুসলমান মনে করে তারাও 'কাফির'। এতদিন পরে বর্তমান জোট সরকার তাদের যাবতীয় বই ও প্রকাশনা নিষিদ্ধ করে এ বিষয়ে প্রথম সরকারী পদক্ষেপ রাখলেন। এজন্য আমরা সরকারকে ধন্যবাদ জানাই। এক্ষণে দাবী জানাই শুধু বই নিষিদ্ধ করে নয়, এদেরকে অনতিবিলম্বে 'কাফির' ঘোষণা করে কাদিয়ানী বিতর্ক শেষ করুন। অমুসলিম সংখ্যালঘু হিসাবে অন্যদের ন্যায় তারা এরা এদেশে বসবাস করুক, আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু ইসলামের নাম নিয়ে প্রতারণা করলে এবং ইসলামের ও ইসলামের নবীর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালালে এদেরকে মুসলমানেরা বরদাশত করবে না। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন! (স. স.)।

প্রবন্ধ

শিক্ষা ব্যবস্থায় ধসঃ কিছু পরামর্শ

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ধস নেমেছে। প্রায় দু'কোটি শিক্ষিত বেকারের বোঝার উপরে শাকের আঁটির মত প্রতি বছরে বাড়ছে কয়েক লাখ শিক্ষিত বেকার। প্রচণ্ড মানসিক চাপে ভুগছেন অভিভাবকগণ। প্রাণপ্রিয় সন্তানদের নিয়ে তারা এখন বিপাকে। অধিকাংশ ছাত্রই মধ্যম প্রতিভার এবং তাদের অধিকাংশই মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। ওদিকে সরকারী প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এমনকি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে লেখাপড়ার মান এখন বলতে গেলে সর্বনিম্ন পর্যায়ে। ফলে এই সুযোগ নিয়েছে কোচিং সেন্টার ব্যবসায়ীরা ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকেরা। অন্যদিকে শহরে-বাজারের অলিতে-গলিতে গজিয়ে উঠছে ব্যাঙের ছাতার মত ক্লিনিক ও প্রাইভেট হাসপাতাল সমূহ। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় সরকারী ব্যর্থতার সুবাদেই যে এগুলি হচ্ছে, তা অস্বীকার করার ক্ষমতা খোদ সরকারেরও নেই। তাহ'লে কি আমরা আবার পুরানো যুগে ফিরে যাচ্ছি। যখন কিছু সংখ্যক জমিদার ও পুঁজিপতির হাতেই বন্দী ছিল হাযার হাযার মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জীবন-জীবিকা।

এদেশ দু'বার স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে। ইসলামের নামে অর্জিত পাকিস্তান আমলের ২৪ বছরে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার কোন জাতীয় লক্ষ্য নির্ধারিত ছিল না। বাংলাদেশ আমলের বিগত ৩২ বছরেও শিক্ষার কোন জাতীয় লক্ষ্য নির্ধারিত হয়নি। এটাই হ'ল এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় গলদ। আমরা আমাদের সন্তানদের ধর্মনিরপেক্ষ ও বস্তুবাদী করে গড়ে তুলব, না ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন আখেরাতমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলব। যদি প্রথমটি উদ্দেশ্য হয়, তবে বুশ-ব্লেয়ার-শ্যারণ ও বাজপেয়ী ধরনের দুনিয়াবী স্বার্থ সর্বস্ব পশ্বাধম মানুষে দেশ ভরে যাবে। ইতিপূর্বে যেমন ফেরাঊন-শাদ্দাদ, নমরূদ ও ক্বারূণে বিশ্ব ভরে গিয়েছিল। দেশব্যাপী বর্তমানে যে সন্ত্রাস চলছে, তাতে যে বস্তুবাদী শিক্ষা ব্যবস্থার কোন অবদান নেই, তা হলফ করে কে বলতে পারে? আর যদি দ্বিতীয় লক্ষ্যে সন্তান গড়ে তোলা হয়, তাহ'লে দেশের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত হবে। বস্তুবাদী রাজনীতিকরা এখন 'মূল্যবোধের সংকট' বলে একটি নতুন পরিভাষা চালু করেছেন। অথচ এটাই হ'ল ঈমানের সংকট, যার কারণে দেশ আজ ডুবতে বসেছে। 'ঈমান' বললে যদি তারা মৌলবাদী বনে যান ও তাদের মদদদাতা বুশ-ব্লেয়ার-বাজপেয়ী চক্র যদি নাখোশ হয়, সেই ভয়ে তারা ভুলেও একবার ঈমানী সংকটের কথা মুখে আনেন না।

দ্বিতীয়তঃ মাদরাসা শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা নামে দেশে প্রচলিত দ্বিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা, যা মূলতঃ ১৯৩৬ সালে বৃটিশ সরকার লর্ড মেকলের মাধ্যমে চালু করে। তাদের 'বিভক্ত কর ও শাসন কর' পলিসির অনুকূলে গৃহীত উক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে তারা মুসলিম উম্মাহ্র শিক্ষিত শ্রেণীকে দু'টি ধারায় বিভক্ত করতে চেয়েছিল। সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিতদেরকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নাইট-নবাব-খানবাহাদুর ইত্যাদি লক্বব এবং সরকারী চাকুরী-বাকুরী ও সুযোগ-সুবিধার জালে আটকিয়ে ফেলে ইংরেজ বিরোধী জিহাদ ও স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে বারিত করাই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য। তাদের এই দূরদর্শী পরিকল্পনা যে সুন্দরভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল, ভুক্তভোগী মাত্রই তা জানেন।

কিন্তু প্রশ্ন হ'লঃ আমরা কি এখনো ইংরেজ আমলে বসবাস করছি? আমরা কি আজও তাদের মানসিক গোলাম হয়ে রয়েছি? নইলে বিগত ৬৭ বছরেও কেন তাদের রেখে যাওয়া দ্বিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা আমরা অন্ধের মত অনুসরণ করে চলেছি? আমরা কি তাহ'লে জাতির শিক্ষিত অংশকে এভাবে বিভক্ত করেই রাখব? দু'টি ভাই কি কখনো একই চেহারায় ও চিন্তাধারায় বেড়ে উঠতে পারবে না?

বাংলাদেশের বিগত সরকারগুলি বিভিন্ন সময়ে যেসব কমিটি গঠন করেছেন, সেখানে দেখা গেছে সবারই মূল টার্গেট ছিল ইসলামী শিক্ষাকে সংকুচিত করা। এরশাদ আমলে গঠিত 'এনাম কমিটি' রিপোর্ট এবং হাসিনা সরকারের আমলে গঠিত 'কুদরত-ই-খুদা' রিপোর্ট এদেশে ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে ছিল সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। শতকরা ৫০ ভাগ মুসলিম প্রধান দেশ মালয়েশিয়ায় শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক। ফলে মালয়েশিয়া আজ সর্বক্ষেত্রে উন্নত। অথচ শতকরা ৯০ ভাগ মুসলিম প্রধান বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা সবচেয়ে অবহেলিত। ফলে আমরা আজ সর্বক্ষেত্রে অধঃপতিত। অতএব এক্ষেত্রে আমাদের প্রস্তাব হ'লঃ

(১) তাওহীদ ও রিসালাতের ভিত্তিতে শিক্ষার আখেরাতমুখী জাতীয় লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে। এজন্য সাধারণ ও কারিগরী শিক্ষার সর্বস্তরে প্রাথমিক হ'তে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করে দেশে একক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হউক। মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত একটি সমন্বিত সিলেবাস রেখে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর থেকে কলা, বাণিজ্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি শাখা বিভক্ত হবে। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে গিয়ে বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ তৈরীর জন্য উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থাকবে। আরবী ও ইসলামী শিক্ষাকে পৃথক ফ্যাকাল্টিতে পরিণত করতে হবে। সেখানে উভয় বিষয়ের বিভিন্ন শাখায় পৃথক বিভাগ সমূহ খুলে তাতে সম্মান, মাষ্টার্স ও পিএইচডি করার সুযোগ রাখতে হবে। যাতে ইসলামের বিভিন্ন শাখায় বিশেষজ্ঞ তৈরী করা সম্ভব হয়। এর বাইরে অন্য বিষয়গুলিতে কমপক্ষে ২০০ নম্বরের ধর্মীয় বিষয় সকল শিক্ষার্থীর জন্য আবশ্যিক থাকবে। এতদ্ব্যতীত ঐসব বিষয়ে পাঠ্য পুস্তক নির্বাচনের সময় ইসলামী

আদর্শের অনুকূলে কিংবা তার সাথে সাংঘর্ষিক নয়, এমন বই সমূহ নির্বাচন করতে হবে। উক্ত উদ্দেশ্য পূরণ করতে গেলে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় দেশের বরেণ্য ইসলামপন্থী শিক্ষাবিদগণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পাঠ্য পুস্তক সমূহ রচনা করাতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, কুরআন-হাদীছ হ'ল আল্লাহ প্রেরিত অভ্রান্ত জ্ঞানের মূল উৎস। এ দু'টি উৎসকে কেন্দ্র করেই মুমিন জীবনের সকল বিষয় আবর্তিত হবে। হিমালয়ের উৎস ধারা থেকে সৃষ্ট নদী প্রবাহকে মানবকল্যাণে ব্যবহারের জন্য যেমন নানাবিধ বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা নিয়োজিত রয়েছে, তেমনি আল্লাহ প্রেরিত ঐশী হেদায়াতের উৎস ধারা থেকে সৃষ্ট জ্ঞানপ্রবাহকে মানবকল্যাণে ব্যবহারের জন্য নানাবিধ বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব প্রাথমিকভাবে মুসলিম উম্মাহ্‌র। অতঃপর ব্যাপক অর্থে সমগ্র মানব সমাজের। আমাদেরকে সে লক্ষ্যেই আমাদের রাষ্ট্রীয় সম্পদকে কাজে লাগাতে হবে।

উপরোক্ত মতে সমন্বিত ও একক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হ'লে পৃথকভাবে মাদরাসা শিক্ষার বা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় নাম রাখার কোন প্রয়োজন হবে না। মসজিদের ইমাম, খত্বীব, দাঈ, মুফতী, মক্তবের শিক্ষক, হাফেযে কুরআন, ম্যারেজ রেজিষ্ট্রার প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্বে লোক সৃষ্টির জন্য সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেই পৃথক পৃথক বিভাগ খোলা যেতে পারে।

(২) বর্তমানের ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সংশোধন করতে হবে। কেননা যে বিষয়টি শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সবচেয়ে ক্ষতিকর বিবেচিত হয়েছে, সেটি হ'ল ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থাপনা। একদিকে দলীয় সরকারের রাজনৈতিক স্বার্থ, অন্যদিকে শৃংখলার নামে অফিস কর্মকর্তাদের সৃষ্ট নানাবিধ আইনী জটিলতার শৃংখল- সবকিছু মিলিয়ে 'হযবরল' অবস্থায় শিক্ষা ক্ষেত্র এখন দুর্নীতির শীর্ষে উঠে এসেছে। সরকারের শক্তিধর মন্ত্রী আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া অবশেষে বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, শিক্ষার জন্য আমরা যতই বরাদ্দ বাড়াচ্ছি, ততই শিক্ষার মান কমে যাচ্ছে। অথচ হাঁড়ির তলার পোড়াকালি ও বাজবরুণের আঠা মিলিয়ে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তালপাতায় লেখা শিখেছি মাসিক ১০/১৫ টাকা বেতনের প্রাইমারী শিক্ষকদের কাছে গোলপাতার চালের তলায় বসে কিংবা কখনো খোলা আকাশের নীচে বসে। শিক্ষা ও নৈতিকতার যে উঁচু মান আমরা সেদিন দেখেছি এবং তাঁদের কাছে ছোট্ট বেলায় যা আমরা শিখেছি, তা জীবনের পড়ন্ত বেলায় এসেও স্মৃতির আয়নায় চকচক করে ভেসে ওঠে। অথচ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে বিলাসী পরিবেশে শিক্ষক হিসাবে যাঁদের সঙ্গ লাভ করেছি, সঙ্গত কারণেই তাঁদের স্মৃতি সুখকর নয়, বরং ভুলতে পারলেই খুশী হই। এর মৌলিক কারণ হ'ল শিক্ষা ব্যবস্থাপনার দুরবস্থা।

শিক্ষা ব্যবস্থাপনার মূল স্তম্ভ হ'ল তিনটিঃ শিক্ষক, ছাত্র ও পারিচালনা কমিটি। গণতন্ত্রের নামে দলীয় রাজনীতির বিষাক্ত ছোবলে এই তিনটি ক্ষেত্রই আজ ক্লেদাক্ত হয়ে গেছে। সর্বক্ষেত্রে দলীয়তাই এখন প্রধান বিবেচ্য বিষয়। আগে শিক্ষকগণ ছিলেন সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। এখন তারা নিজ দলীয় ছাত্রদের ভাই ও ফেণ্ড-এর পর্যায়ে নেমে এসেছেন। বিরোধী মতের ছাত্র ও শিক্ষকগণ প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে পরস্পরের বৈরী হিসাবে গণ্য হন। এমনকি খাতায় নম্বর দেওয়ার নিরপেক্ষতাও এখন অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। দলবাজ ছাত্র নেতাদের রক্ত চক্ষুর ভয়ে এমনকি মেডিকেল কলেজের মত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও অনৈতিক নম্বর দিয়ে কিংবা অনেক ক্ষেত্রে বিনা মৌখিক পরীক্ষায় পাস করিয়ে দিতে শিক্ষকগণ বাধ্য হচ্ছেন। এরাই ডিগ্রী নিয়ে দু'দিন পরে চিকিৎসার নামে রোগী হত্যা করবে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় গুলিকে এখন আর মেধার লালন ক্ষেত্র বলা যাবে না। বরং এগুলি এখন রাজনৈতিক দলবাজি এবং দল পোষণের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। স্কুল-কলেজ-মাদরাসার কমিটি সমূহের সর্বোচ্চ পদে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকারী কর্মকর্তারা থাকেন। অথচ সরকারী অফিসগুলিতে দায়িত্ব সচেতন, সৎ ও মেধাসম্পন্ন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যেমন অভাব, তেমনি সেখানে রয়েছে ফাইল আটকিয়ে ঘুষ-বখশিশ আদায়ের অঘোষিত নেটওয়ার্ক। ফলে যে প্রতিষ্ঠানের প্রধান ঘুষদানে ও মিথ্যা ফাইল তৈরীতে পারঙ্গম, সে প্রতিষ্ঠান সর্বদা সরকারের সুদৃষ্টিতে থাকে। যাদের সে ক্ষমতা নেই, তাদের দোষত্রুটির অন্ত নেই।

তাছাড়া এইসব প্রতিষ্ঠানের কমিটি ব্যবস্থাপনায় রয়েছে গণতন্ত্রের নামে কথিত নির্বাচনী ব্যবস্থা। অথচ কে না জানে যে, যেখানে নির্বাচন সেখানেই গ্রুপিং। প্রতি বছর অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচন, শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন, ছাত্র সংসদ নির্বাচন ইত্যাকার হরেক রকমের নির্বাচনী গ্রুপিংয়ে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-ছাত্র ও পরিচালনা কমিটির মধ্যকার পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সম্প্রীতি ও ভালবাসা ধ্বংস হয়। কমিটির সদস্য হবার জন্য যত না দৌড়ঝাঁপ দেখা যায়, সদস্য হবার পরে প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য তাদের তেমন কোন তৎপরতা দেখা যায় না। বরং তাদের এলাকার ও নিজেদের ছেলে মেয়ে বা নিকটাত্মীয়দেরকে প্রতিষ্ঠানে চাকুরী দেওয়া এবং এজন্য যেকোন নরম-গরম পন্থা অবলম্বন করাই যেন কমিটি সদস্যদের প্রধান দায়িত্ব বলে মনে করা হয়। ফলে প্রয়োজনীয় তদারকি এবং আদর্শ শিক্ষক-কর্মকর্তার অভাবে শিক্ষার মান কমতে থাকে। প্রাণহীন দেহের ন্যায় মানহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেবল দর্শনীয় কাঠামো হিসাবে দাঁড়িয়ে থাকে। যেমন আজকাল বিশাল বিশাল ইমারত সর্বস্ব বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেখা যাচ্ছে। যারা জীবন দিয়ে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন, তাদের যথার্থ মূল্যায়ন করা হয় না। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার মহতী উদ্যোগে এগিয়ে আসতে এখন আর কাউকে তেমন খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ এদেশের যত বড় বড় প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রায় সবই গড়ে উঠেছে ব্যক্তি উদ্যোগে ও ব্যক্তি ব্যবস্থাপনায়। মক্তব, মাদরাসা ইত্যাদি

আজও মূলতঃ গড়ে ওঠে ব্যক্তি উদ্যোগে।

এগুলির অধিকাংশের শিক্ষার মান ধ্বংস হয়েছে সরকারী অন্যায় হস্তক্ষেপে ও ভুল ব্যবস্থাপনার কারণে। যদিও সরকারী অর্থে এগুলির অনেকটিরই ভৌত কাঠামোর শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। বেড়েছে শিক্ষক ও ছাত্র সংখ্যা। কিন্তু বাড়েনি কেবল শিক্ষার মান। সবই যেন এখন অনেকটা গতানুগতিক হয়ে গেছে। প্রতিষ্ঠানের প্রতি শিক্ষক-ছাত্র বা কমিটির লোকদের হৃদয় উৎসারিত ভালবাসা এখন বলতে গেলে শূন্যের কোঠায়। যদিও রজত জয়ন্তী, সুবর্ণ জয়ন্তী, হীরক জয়ন্তী ইত্যাকার চটকদার নামে অনেক প্রতিষ্ঠানে এখন বড় বড় অনুষ্ঠান করা হচ্ছে। তাইতো দেখি স্বার্থে সামান্যতম আঘাত লাগলেই মিটিং-মিছিল শুরু হয়। আর অধিকার আদায়ের নামে প্রতিষ্ঠানের চেয়ার-টেবিল, জানালা-দরজা ও মূল্যবান সম্পদরাজি ভাংচুর করা হয়। এমনকি মারামারি ও জীবনহানির ঘটনাও ঘটে। দলীয় রাজনীতি যেভাবে দেশের প্রশাসনকে ধ্বংস করেছে, একই অপরাজনীতি এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাপনাকে ধ্বংস করেছে। অতএব এক্ষেত্রে আমাদের পরামর্শ হ'লঃ

(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর সরকার কর্তৃক মনোনীত হবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি সমূহ থেকে জ্যেষ্ঠতম ১৫ জন শিক্ষক নিয়ে গঠিত একটি সিণ্ডিকেট-এর সাথে পরামর্শ ক্রমে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করবেন। প্রো-ভিসি, ট্রেজারার, রেজিষ্ট্রার সহ সকল প্রশাসনিক পদ হবে ভিসি-র মনোনীত। সকল বিষয়ে ভিসি হবেন দল নিরপেক্ষ এবং সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। শিক্ষক ও ছাত্রদের জন্য রাজনৈতিক ও আঞ্চলিক সকল প্রকারের দলাদলি নিষিদ্ধ থাকবে। শিক্ষক, অফিসার এবং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের মধ্য থেকে জ্যেষ্ঠতর ১১ জন তাদের স্ব স্ব সমিতির প্রতিনিধিত্ব করবে। ছাত্রদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্রসহ প্রতি ফ্যাকাল্টির সেরা এক বা দু'জন ছাত্রকে নিয়ে সর্বোচ্চ ১৫ জনের একটি 'ছাত্র সংসদ' গঠিত হবে। তবে ছাত্র সংসদের ভিপি ও জিএসকে অবশ্যই মাষ্টার্স ও ৪র্থ বর্ষ সম্মান শ্রেণীর ছাত্র হ'তে হবে। প্রতিটি বিভাগেও অনুরূপভাবে মেধা ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে ১১ জনের একটি বিভাগীয় ছাত্র সংসদ থাকবে। কলেজ সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও প্রয়োজনবোধে মেধা ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। এই সাথে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত Community teaching system (CTS) পদ্ধতিতে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান এবং প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি বাদ দিয়ে 'পাঠমুখী পরীক্ষা' পদ্ধতি চালু করা যরূরী। যাতে পরীক্ষায় নকল আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যায়।

(২) সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সর্বপ্রকারের দলাদলিমুক্ত রাখতে হবে এবং গ্রুপিং করাটাই সবচাইতে বড় অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হবে।

(৩) সরকার ইসলামের অনুকূলে শিক্ষানীতি নির্ধারণ করবে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের আর্থিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে পৃষ্ঠপোষকতা দিবে। সরকার প্রশাসনিক ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করবে না। তবে প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান ক্ষুণ্ন হ'লে এবং অন্যান্য কোন বড় ক্ষতির কারণ দেখা দিলে চূড়ান্ত পর্যায়ে সরকার অবশ্যই হস্তক্ষেপ করবে।

(৪) বিশ্ববিদ্যালয় সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের সময় মেধা ও যোগ্যতা নিরূপণের জন্য সর্বস্তরে উচ্চতর শ্রেণী দেখার সাথে সাথে তাদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা নিতে হবে এবং তাদের আক্বীদা, আচরণ ও দেশপ্রেম যাচাই করতে হবে। শিক্ষকগণ জাতির গুরু। সে হিসাবে তাদের বেতন স্কেল সরকারী সকল ক্যাডার সার্ভিসের উপরে থাকতে হবে এবং তা অন্যদের থেকে পৃথক থাকবে। তাদের বিনা সূদে গৃহ নির্মাণ ঋণ সুবিধা দিতে হবে এবং তাদের উপরে নির্ভরশীল পোষ্যদের শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যয় সরকারকে বহন করতে হবে। যাতে নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে তাদের অন্যত্র কোন পেশায় জড়িয়ে পড়তে না হয়।

(৫) শিক্ষা সিলেবাসে ছাত্রদেরকে তাদের স্ব স্ব ধর্ম ও মাযহাবের বই অধ্যয়নের সুযোগ রাখতে হবে এবং বিভাগ ও অনুষদ ওয়ারী নিয়মিত বিতর্ক সভা, আলোচনা সভা, সাহিত্য প্রতিযোগিতা, সাময়িকী প্রকাশ ইত্যাদির মাধ্যমে ছাত্রদের প্রতিভা বিকাশের অপরিহার্য বিধান চালু করতে হবে।

(৬) শিক্ষকদের মধ্যকার বিরোধ প্রধান শিক্ষকের সভাপতিত্বে একাডেমিক কমিটির বৈঠকেই নিষ্পত্তি করতে হবে। প্রধান শিক্ষকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। সহযোগী হিসাবে তাঁর মনোনীত তিন বা পাঁচ জন শিক্ষকের একটি সাব কমিটিকে শৃংখলা বিষয়ক দায়িত্বশীল নিয়োগ করা যেতে পারে। শিক্ষক-ছাত্রের যাবতীয় বিরোধ প্রথমে তাদের কাছে আসবে এবং তারাই তা মিটানোর চেষ্টা করবেন। প্রধান শিক্ষকের কোন স্বেচ্ছাচারিতা প্রকাশ পেলে এবং শিক্ষার মান ও শিক্ষা পরিবেশের অবনতি দেখা দিলে সেখানেই কেবল পরিচালনা কমিটি হস্তক্ষেপ করবে এবং কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

(৭) ব্যক্তি উদ্যোগকে উৎসাহিত করার জন্য সরকারীভাবে ব্যাপক প্রচারণার সাথে সাথে সক্রিয় কর্ম কৌশল নির্ধারণ করতে হবে। এজন্য প্রতিষ্ঠাতা ব্যক্তি, ট্রাষ্ট বা সংগঠনকে বা তাদের প্রতিনিধিকে পরিচালনা কমিটির মূল দায়িত্বে রেখে যথাযথ মূল্যায়ন করতে হবে। ইসলামী আক্বীদার অনুকূলে প্রতিষ্ঠাতার অছিয়ত বা আদর্শকে শ্রদ্ধা করার মধ্যেই তার প্রকৃত মূল্যায়ন নিশ্চিত হবে। এর দ্বারা দেশের সম্পদশালী ব্যক্তিগণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনে আগ্রহী হবেন এবং সরকারের বহু অর্থের সাশ্রয় হবে। এখানে একটা বিষয় অবশ্যই নীতিমালায় থাকতে হবে যেন উচ্চ শিক্ষিত ও গুণী ব্যক্তি ছাড়া কেবল টাকা ও ভোটের জোরে বা আঞ্চলিকতার দোহাই দিয়ে কোন অশিক্ষিত, কমশিক্ষিত বা

কম বয়সী লোক কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটিতে না আসতে পারে। যেমনটি আজকাল বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমনকি সরকারী ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে ঘটতে দেখা যাচ্ছে।

(৮) ছেলে ও মেয়েদের পৃথক শিক্ষা পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে এবং সহ-শিক্ষা ব্যবস্থা বাতিল করতে হবে। এজন্য পৃথক ক্যাম্পাস ও ভৌতকাঠামো নির্মাণ অসম্ভব হ'লে একই ক্যাম্পাসে পৃথক সময় ভাগ করে শিফটিং ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

(৯) ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক কর্মক্ষেত্র ও কর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। যাতে তারা মানসিক চাপমুক্ত পরিবেশে জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে।

(১০) বর্তমানের চাকুরীমুখী ও বিদেশমুখী প্রবণতা রোধ করার উদ্দেশ্যে শিক্ষিত জনশক্তির জন্য দেশেই উৎপাদন মুখী স্বকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। দেশের মাটিতেই যে অপার সম্ভাবনা লুকিয়ে রয়েছে, সে বিষয়ে গবেষণার জন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে ও প্রয়োজনে উপযেলা বা ইউনিয়ন ভিত্তিক 'গবেষক সেল' গঠন করে সেখানে তাদের 'উদ্বুদ্ধকরণ ভাতা' প্রদান করতে হবে। তাদেরকে গবেষণা সহায়ক দ্রব্যাদি সহ প্রয়োজনীয় সবকিছু সরবরাহ করতে হবে। নিজের পায়ে না দাঁড়ানো পর্যন্ত নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য এ ভাতা চালু রাখতে হবে। ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের উৎসাহিত করতে হবে এবং বিজ্ঞানী নাজমুল হুদার ন্যায় দেশের বিজ্ঞান প্রতিভা সমূহের স্বার্থক সদ্ব্যবহারের জন্য উদারভাবে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা দিতে হবে।

(১১) ইসলাম বিরোধী এবং আক্বীদা বিনষ্টকারী সকল প্রকার সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ড থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহকে মুক্ত রাখতে হবে।

প্রসঙ্গক্রমে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, কিণ্ডারগার্টেন ও প্রাইভেট স্কুল-মাদরাসা সম্বন্ধে বলতে হয়। এগুলি বর্তমানে রীতিমত শিক্ষা-বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে রূপলাভ করেছে। দেশে বর্তমানে ৫২টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৩৭ হাযার ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা করে। রাজধানীর অলিতে-গলিতে ফ্লোর ভাড়া নিয়ে খুপরি ঘরে প্রতিষ্ঠিত এই সব সাইনবোর্ড সর্বস্ব কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ১০/১২ জন বলে জানা যায়। দূরশিক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কোন ক্যাম্পাস প্রয়োজন হয় না। বাড়ীতে বসেই শিক্ষা ও ডিগ্রী লাভ করা যায়। তাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় বিজনেস স্টাডিজ (BBA/MBA) ও কম্পিউটার সায়েন্স সর্বস্ব। মৌলিক জ্ঞানের কোন বিভাগ এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই বললেই চলে। এই সব বিশ্ববিদ্যালয় মূলতঃ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পার্ট-টাইম সেবা অথবা লিয়েনে কিংবা প্রেষণে উচ্চ বেতনে চাকুরীর মাধ্যমে চলে। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্ব স্ব প্রতিষ্ঠাতা কমিটির চেয়ারম্যান ও নিয়োগকৃত ভাইস চ্যান্সেলরের দ্বৈত শাসনে জর্জরিত। চেয়ারম্যান তার অর্থনৈতিক স্বার্থকে এবং ভাইস চ্যান্সেলর তার একাডেমিক স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেন। কিন্তু অবশেষে একাডেমিক স্বার্থ পরাভূত হয়। সেকারণ দেখা যায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় অকৃতকার্য ছাত্রদের অধিকাংশ বহু টাকার বিনিময়ে এইসব প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ভর্তি হয়। যদিও দু'চারটি বাদে প্রায় সকল প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের পরিবেশ বলতে তেমন কিছু নেই। ফলে কিছু ডিগ্রীধারী ব্যক্তি সৃষ্টি হলেও সত্যিকারের 'লার্নেড' ও 'লিটারেট' ব্যক্তি সৃষ্টি হচ্ছে না। অবশ্য কিছু ব্যতিক্রম অবশ্যই রয়েছে।

কিণ্ডারগার্টেন, ক্যাডেট মাদরাসা ও স্কুল এগুলিও এক ধরনের গলাকাটা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। এরা শিশু শ্রেণীতেই একটা বাচ্চাকে 'মহাপণ্ডিত' বানিয়ে ফেলার স্বপ্ন দেখায়। ইংরেজী, বাংলা, আরবীর এক বোঝা বই সিলেবাস দিয়ে ছোট্ট শিশুর মুখ দিয়ে কিছু আরবী, ইংরেজী আপ্তবাক্য মুখস্ত করিয়ে বাপ-মাকে তাক লাগিয়ে দেয় ও তাদের পকেট থেকে মাসে মাসে হাযার হাযার টাকা হাতিয়ে নেয়। অথচ ঐসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের যোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন রয়েছে। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাদরাসাগুলির ব্যর্থতা ও অপ্রতুলতার কারণে সুযোগসন্ধানী লোকেরা এভাবে সর্বত্র শিক্ষাবাণিজ্য শুরু করেছে। অসহায় অভিভাবকগণ বাধ্য হয়ে এদের দ্বারস্থ হচ্ছেন।

এর বাস্তব ফলাফল হিসাবে দেশে ধনিক ও গরীব শ্রেণীর বৈষম্য দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা আগামী দিনে সাংঘর্ষিক রূপ নিবে এবং যাকে সামাল দেওয়া সরকারের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় এ ধরনের পুঁজিবাদী শিক্ষাব্যবস্থার কোন সুযোগ নেই। ইসলাম শিক্ষাকে সকলের জন্য 'ফরয' করেছে। অতএব তাকে অবশ্যই সকলের নাগালের মধ্যে আনার ব্যবস্থা রাখতে হবে। চিন্তাশীল সমাজ ও সরকারকে অবশ্যই এ নিয়ে ভাবতে হবে।

এক্ষেত্রে আমাদের পরামর্শ হ'লঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের মত একটি মহৎ ও বৃহৎ শিক্ষাগারকে প্রাইভেট সেক্টরে না রেখে সরকারের হাতে রাখুন। তবে প্রাইভেট উদ্যোগকে উৎসাহিত করার জন্য উদ্যোক্তা ব্যক্তি, ট্রাষ্ট বা সংগঠনকে মূল্যায়ন করুন। বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালগুলির ক্ষেত্রেও আমাদের একই পরামর্শ থাকবে। মোট কথা শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মত জন গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরকে লাগাম ছাড়া করা যাবে না। করলে স্বার্থবাদীরা সুযোগ নিবে। এমনকি দেশদ্রোহীরাও সংগোপনে এসবের আড়ালে তাদের স্বার্থ হাছিলে মেতে উঠতে পারে।

ঐ সকল হারাম যেগুলিকে জনগণ হালকা মনে করে অথচ তা থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব

*মূলঃ মুহাম্মাদ ছালিহ আল-মুনাজ্জিদ**
*অনুবাদঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক***

(৭ম কিস্তি)

সন্তানদের উপহার প্রদানে সমতা রক্ষা না করাঃ

আমাদের সমাজে এমন অনেক মাতা-পিতা আছেন, যারা এক সন্তানকে 'হেবা' বা উপহার দিলে অন্যান্য সন্তানকে দেন না। নিয়ম হ'ল, সন্তানদের সবাইকে বিশেষ কোন উপহার সমান হারে দিতে হবে; আর না হ'লে কাউকে দেয়া যাবে না। নিয়ম লংঘন করে সন্তান বিশেষকে দেয়া ও অন্যদের বঞ্চিত করা ঠিক নয়। শারঈ কারণ ব্যতীত এরূপ দান করলে তা হারাম বলে গণ্য হবে। শারঈ কারণ বলতে, সন্তানদের একজনের এমন প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, যা অন্যদের নেই। যেমন- সে অসুস্থ, কিংবা বেকার, অথবা ছাত্র, কিংবা সংসারে তার সদস্য সংখ্যা অনেক তথা সে পোষ্য, ভারাক্রান্ত, অথবা সে কুরআন মুখস্থ করেছে তাই উৎসাহ ধরে রাখতে কিছু দেয়া ইত্যাদি। পিতা এরূপ শারঈ কারণবশতঃ কোন সন্তানকে কিছু দেয়ার সময় নিয়ত করবে যে, অন্য কোন সন্তানের যদি এরূপ প্রয়োজন দেখা দেয় তাহ'লে তাকেও তিনি তার প্রয়োজন মত দিবেন। এ কথার সাধারণ দলীল আল্লাহ্র বাণী-

اِعْدِلُوْا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوْا اللّٰهَ-

'তোমরা সুবিচার কর। ইহা আল্লাহ্ভীতির অধিকতর নিকটবর্তী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর' *(মায়েদাহ ৮)*। আর বিশেষ দলীল হ'ল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ। একদা নু'মান বিন বাশীর (রাঃ)-এর পিতা তাকে রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'আমি আমার এই পুত্রকে একটা দাস দান করেছি'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একথা শুনে বললেন, 'তোমার সকল সন্তানকে কি তার মত করে দান করেছ? পিতা বললেন, 'না'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তাহ'লে উক্ত দান ফেরত নাও'। অন্য বর্ণনায় আছে, 'তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের সন্তানদের মধ্যে সুবিচার কর'। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি বাড়ী ফিরে এসে ঐ দাস ফেরত নেন। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তুমি আমাকে সাক্ষী করো না। কেননা যুলুমের সাক্ষী আমি হ'তে পারি না'।[১]

কোন কোন পিতাদের দেখা যায় যে, তারা সন্তান বিশেষকে অহেতুক অগ্রাধিকার দানে আল্লাহকে ভয় করেন না। এর ফলে সন্তানদের মধ্যে মন কষাকষির সৃষ্টি হয়। তারা একে অপরের প্রতি শত্রু ও বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। কখনো কোন সন্তানকে পিতৃকুলের আকৃতি পাওয়ার জন্য দেওয়া হয়, অন্য সন্তানকে মাতৃকুলের আকৃতি পাওয়ার জন্য বঞ্চিত করা হয়। এক স্ত্রীর সন্তানকে দেওয়া হয়, অন্য স্ত্রীর সন্তানদের দেওয়া হয় না। আবার অনেক সময় তাদের একজনের সন্তানদেরকে বিশেষ ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয়, কিন্তু অন্যজনের সন্তানদের ক্ষেত্রে অনুরূপ ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। এর কুফল অচিরেই ঐসব মাতা-পিতাকে ভোগ করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রেই ঐসব বঞ্চিত সন্তান ভবিষ্যতে তাদের পিতার সঙ্গে সদাচরণ করে না।

সন্তানদের মধ্যে দান-দক্ষিণায় কাউকে বেশী গুরুত্ব দেয় এমন ব্যক্তি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُوْنُوْا إِلَيْكَ فِى الْبِرِّ سَوَاءً-

'তোমার সন্তানেরা তোমার সাথে সমান সদাচরণ করুক তাতে কি তুমি খুশী নও?'।[২] সুতরাং সন্তানদের প্রতি দান-দক্ষিণায় সমতা রক্ষা করা অপরিহার্য।

ভিক্ষাবৃত্তিঃ

সাহ্ল বিন হানযালা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيْهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ قَالُوْا وَمَا الْغِنَى الَّذِىْ لَاتَنْبَغِىْ مَعَهُ الْمَسْئَلَةُ قَالَ قَدْرُ مَا يُغْدِيْهِ وَيُعَشِّيْهِ-

'যার নিকট অভাব মোচনের মত সামগ্রী আছে অথচ সে ভিক্ষা করে সে জাহান্নামের অঙ্গারকেই কেবল বৃদ্ধি করে। ছাহাবীগণ আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাঃ)! কতটুকু সম্পদ থাকলে ভিক্ষা করা উচিৎ নয়? উত্তরে তিনি বললেন, সকাল-সন্ধ্যায় খাওয়া চলে এমন পরিমাণ সম্পদ'।[৩]

ইবনু মাস'উদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيْهِ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُدُوْشًا أَوْ كُدُوْشًا فِى وَجْهِهِ-

'অভাবমুক্ত হয়েও যে ব্যক্তি ভিক্ষা করে, ক্বিয়ামত দিবসে সে মুখে গোশত শূন্য হয়ে উঠবে'।[৪]

অনেক ভিক্ষুক মসজিদে আল্লাহ্র বান্দাদের সামনে দাঁড়িয়ে তাদের অভাব-অভিযোগের ফিরিস্তি আওড়াতে থাকে।

** প্রখ্যাত আলেম, সঊদী আরব।*
*** সহকারী শিক্ষক, ঝিনাইদহ সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।*
১. মুসলিম ৩/১২৪৩ পৃঃ; ফাৎহুল বারী ৫/২১১ পৃঃ।
২. আহমাদ ৪/২৬৯; ছহীহ মুসলিম হা/১৬২৩।
৩. আবুদাঊদ ২/২৮১ পৃঃ; ছহীহুল জামে' হা/৬২৮০।
৪. আহমাদ ১/৩৮৮; ছহীহুল জামে' হা/৬২৫৫।

অনেকে মিথ্যা বলে এবং কার্ড তুলে ধরে। অনেকে আবার মনগড়া কাহিনী বলে ভিক্ষা করে। কোন কোন ভিক্ষুক স্বীয় পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন মসজিদ ও জনসমাগম স্থলে ভাগ করে দেয়। দিন শেষে তারা একস্থানে একত্রিত হয়ে নিজেদের আয় গুণে দেখে। এভাবে তারা যে কত ধনী হয়েছে তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। যখন তারা মৃত্যুবরণ করে, তখন জানা যায় কি পরিমাণ সম্পদ তারা রেখে গেছে।

পক্ষান্তরে একদল প্রকৃতই অভাবী রয়েছে। যাদের সংযম দেখে তাদের অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে ধনী বলেই মনে করে। তারা কাকুতি মিনতি করে লোকদের নিকটে চায় না। ফলে তাদের অবস্থা যেমন জানার বাইরে থেকে যায়, তেমনি তাদের কিছু দেওয়াও হয় না।

ঋণ পরিশোধে অনীহা প্রকাশঃ

মহান রাব্বুল আলামীনের নিকটে বান্দার হক অতীব গুরুত্ববহ। আল্লাহ্‌র হক নষ্ট করলে তওবার মাধ্যমে ক্ষমা পাওয়া যায়। কিন্তু বান্দার হক নষ্ট করলে সংশ্লিষ্ট বান্দার নিকট থেকে ক্ষমা না পেলে ক্ষমা লাভের কোন উপায় নেই। ক্বিয়ামতের দিন টাকা-পয়সার কোন কারবার হবে না। সেদিন হকদারের পাপ হক আত্মসাৎকারীকে দেওয়া হবে এবং হক আত্মসাৎকারীর নেকী হকদারকে দেওয়া হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا-

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে এই মর্মে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানতকে তার প্রাপকের নিকটে অর্পণ করবে' *(নিসা ৫৮)*।

বর্তমান সমাজে ঋণ গ্রহণ একটি মামুলী ও গুরুত্বহীন বিষয় বলে বিবেচিত। অনেকে অভাবের জন্য নয়; বরং প্রাচুর্য সৃষ্টি ও নতুন নতুন বাড়ী, গাড়ী, আসবাবপত্র ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য ঋণ নিয়ে থাকে। অনেক সময় এরা কিস্তিতে বেচা-কেনা করে থাকে, যার অনেকাংশই সন্দেহপূর্ণ বা হারাম।

ঋণ পরিশোধকে লঘু বা সাধারণভাবে নিলে প্রায়শই সেখানে টালবাহানা ও গড়িমসি সৃষ্টি হয়। ক্ষেত্রবিশেষে তাতে অপরের সম্পদ বিনষ্ট করা হয়। এর শোচনীয় পরিণতি বর্ণনা করতে গিয়ে নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيْدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ-

'যে ব্যক্তি পরিশোধের নিয়তে মানুষের সম্পদ গ্রহণ করে, আল্লাহ তা'আলা তার পক্ষ থেকে তা পরিশোধ করে দেন। আর যে তা বিনষ্ট করার নিয়তে গ্রহণ করে থাকে, আল্লাহ তাকে বিনষ্ট করে দেন'।[৫]

মানুষ ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে বড় উদাসীন। তারা এটাকে খুবই হালকাভাবে নিয়ে থাকে। অথচ আল্লাহ্‌র নিকট তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি আল্লাহ্‌র রাস্তায় শহীদের এতসব মর্যাদা ও অগণিত ছওয়াব থাকা সত্ত্বেও ঋণ পরিশোধের দায় থেকে সে অব্যাহতি পায়নি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ التَّشْدِيْدِ فِى الدَّيْنِ وَالَّذِىْ نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلاً قُتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيِىَ ثُمَّ قُتِلَ ثُمَّ أُحْيِىَ ثُمَّ قُتِلَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ-

'সুবহানাল্লাহ! ঋণ প্রসঙ্গে কী কঠোর বাণীইনা আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেছেন। যার হাতে আমার জীবন তার শপথ, ঋণগ্রস্ত অবস্থায় কেউ যদি আল্লাহ্‌র পথে শহীদ হয় তারপর জীবিত হয়, তারপর শহীদ হয়, তারপর জীবিত হয়, তারপর আবার শহীদ হয় তবুও ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না'।[৬] এরপরও কি ঋণ পরিশোধে টালবাহানাকারী মতলববাজদের হুঁশ ফিরবে না?

হারাম ভক্ষণঃ

যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে না সে কোথা থেকে অর্থ উপার্জন করল এবং কোথায় ব্যয় করল তার কোন পরোয়া করে না। তার একটাই ইচ্ছা সম্পদ বৃদ্ধি করা। চাই তা হারাম, অবৈধ যে পথেই হৌক। এ জন্য সে ঘুষ, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, আত্মসাৎ, হারাম দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়, সূদ, ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ, জ্যোতিষী, বেশ্যাবৃত্তি, গান-বাজনা ইত্যাদি হারাম কাজের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন, এমনকি মুসলমানদের সরকারী কোষাগার কিংবা জনগণের সম্পদ কুক্ষিগত করা, মানুষকে সংকটে ফেলে তার সম্পদ হস্তগত করা, ভিক্ষাবৃত্তি ইত্যাদি যেকোন উপায়ে অর্থ উপার্জন করে। অতঃপর সে ঐ অর্থ হ'তে খায়, পরিধান করে, বাড়ী-ঘর তৈরী করে কিংবা বাড়ী ভাড়া নিয়ে দামী আসবাবপত্র দিয়ে সাজায়। এভাবে হারাম দিয়ে তার উদর পূর্তি করে। অথচ নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

كُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ-

'যে গোশত হারাম কর্মকাণ্ড হ'তে উৎপন্ন হয়েছে, জাহান্নামের জন্য তা সবচেয়ে বেশী উপযুক্ত'।[৭] আর ক্বিয়ামতের দিনেও তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কোথা থেকে সে ধন-সম্পদ উপার্জন করেছে এবং কোথায় ব্যয় করেছে। সুতারাং এই শ্রেণীর লোকদের জন্য শুধু ধ্বংসই অপেক্ষা করছে।

---

৫. বুখারী, ফৎহুল বারী ৫/৫৪ পৃঃ।

৬. নাসাঈ, ছহীহুল জামে' হা/৩৫৯৪।

৭. তাবারাণী, ছহীহুল জামে' হা/৪৪৯৫।

মদ্যপানঃ

[মদ তথা নেশার দ্রব্যাদি আধুনিক সভ্যতার এক নিদারুণ অভিশাপ। নেশার আবেশে আজকের পৃথিবী তলিয়ে যাচ্ছে। যতই আইন-কানূন করে ও বিরুদ্ধ প্রচার চালিয়ে বন্ধের চেষ্টা করা হচ্ছে, ততই যেন প্রতিনিয়ত তা প্রসার লাভ করছে। বর্তমান সভ্যতার মুখে এ এক নির্লজ্জ চপেটাঘাত। অথচ বহু পূর্বেই ইসলাম শুধু মদ পান করাই হারাম করেনি; বরং এর উৎপাদন ও বেচা-কেনা পর্যন্ত হারাম করেছে এবং পানকারীর জন্য দৈহিক শাস্তি নির্ধারণ করেছে। -লেখক]

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ-

'নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তি ও ভাগ্য নির্ণায়ক তীর বা লটারী অপবিত্র শয়তানী কাজ ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং তোমরা এগুলি থেকে বিরত থাক। আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে' *(মায়দাহ ৯০)*।

মদ পান হারাম এবং তা হ'তে বিরত থাকার এটি অন্যতম শক্তিশালী দলীল। আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াতে মদের সঙ্গে মূর্তির কথা উল্লেখ করেছেন। মূর্তি কাফেরদের উপাস্য ও দেব-দেবীর সাধারণ নাম। মূর্তি পূজা হারাম হেতু মদ্যপানও হারাম।

মদ্যপান সম্পর্কে হাদীছেও কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ عَلَى اللهِ عَهْدًا لِّمَنْ يَّشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَّسْقِيَهُ مِنْ طِيْنَةِ الْخَبَالِ، قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا طِيْنَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ-

'যে ব্যক্তি মদ্যপান করে তার জন্য আল্লাহ্র অঙ্গীকার হ'ল, তিনি তাকে 'ত্বীনাতুল খাবাল' পান করাবেন। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! 'ত্বীনাতুল খাবাল' কি? তিনি বললেন, জাহান্নামবাসীদের ঘাম অথবা পূঁজ-রক্ত'।[৮]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ مَّاتَ مُدْمِنَ خَمْرٍ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ كَعَابِدِ وَثَنٍ-

'শরাবপায়ীরূপে যে মারা যাবে, (ক্বিয়ামতে) সে একজন মূর্তিপূজকের ন্যায় আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাত করবে'।[৯]

আমাদের যুগে হরেক রকম মদ ও নেশা জাতীয় দ্রব্যাদি বেরিয়েছে। তাদের নামও আরবী, আজমী বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। যেমন- বিয়ার, হুইস্কি, নির্যাস, ভদকা, শ্যামপেন, কোডিন, মরফিন, প্যাথেডিন, হেরোইন, ড্রাগ ইত্যাদি।

নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِيْ الْخَمْرَ يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا- 'নিশ্চয়ই আমার উম্মতের কিছু লোক মদ পান করবে, তারা উহার ভিন্ন নামকরণ করে নেবে'।[১০]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী উক্ত নাম পাল্টিয়ে মদ পানকারী মুসলমানও বর্তমান যামানায় প্রকাশ পেয়েছে। তারা উহার নাম দিয়েছে 'রুহানী টনিক' বা 'স ীবনী সুধা'। অথচ এটা নিছক মিথ্যার উপর প্রলেপ ও প্রতারণা মাত্র। এই সমস্ত প্রতারকদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

يُخَادِعُوْنَ اللهَ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَمَا يَخْدَعُوْنَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ-

'তারা আল্লাহ ও ঈমানদারদের সাথে প্রতারণা করে অথচ তারা যে নিজেদের সাথেই প্রতারণা করছে তা তারা অনুধাবন করতে পারছে না' *(বাক্বারাহ ৯)*।

মদ কি এবং তার বিধান কি হবে শরী'আতে তার পরিপূর্ণ নীতিমালা তুলে ধরা হয়েছে, যাতে ফিৎনা ও দ্বন্দের মূলোৎপাটন করা হয়েছে। এই নীতিমালা হ'ল-

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ-

'প্রত্যেক নেশার দ্রব্যই 'খামর' বা মদ এবং প্রত্যেক নেশার দ্রব্যই হারাম'।[১১]

সুতরাং যা কিছু মস্তিষ্কের সঙ্গে মিশে জ্ঞান-বুদ্ধিকে নেশাগ্রস্ত করে তোলে তাই হারাম। চাই তা কম হৌক বা বেশী হৌক; তরল পদার্থ হৌক কিংবা কঠিন পদার্থ হৌক। এসব নেশার দ্রব্যের নাম যাই হৌক মূলতঃ এরা সবই এক এবং এদের বিধানও এক।

পরিশেষে মদ্যপায়ীদের উদ্দেশ্যে নবী করীম (ছাঃ)-এর একটি উপদেশবাণী তুলে ধরা হ'ল। তিনি বলেছেন,

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا وَ إِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ- فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ- فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ أَرْبَعِيْنَ

---

৮. মুসলিম ৩/১৫৮৭ পৃঃ।
৯. তাবারাণী ২/৪৫; ছহীহুল জামে' হা/৬৫২৫।
১০. আহমাদ ৫/৩৪২ পৃঃ; ছহীহুল জামে' হা/৫৪৫৩।
১১. মুসলিম ৩/১৫৮৭ পৃঃ।

صَبَاحًا، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ رَدْغَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ وَمَا رَدْغَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ-

'যে ব্যক্তি মদ পান করে ও নেশাগ্রস্ত হয় তার চল্লিশ দিনের ছালাত কবুল হবে না। যদি সে ঐ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাহ'লে জাহান্নামে যাবে। আর যদি তওবা করে তবে আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন। পুনরায় যদি সে মদ পান করে ও নেশাগ্রস্ত হয় তবে তার চল্লিশ দিনের ছালাত কবুল হবে না। যদি সে ঐ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাহ'লে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। পুনরায় সে যদি মদ পান করে ও নেশাগ্রস্ত হয় তবে তার চল্লিশ দিনের ছালাত কবুল হবে না। যদি সে ঐ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাহ'লে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। পুনরায় যদি সে মদ পান করে তবে তাকে ক্বিয়ামত দিবসে 'রাদগাতুল খাবাল' পান করানো আল্লাহ্র জন্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়াবে। ছাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাঃ)! 'রাদগাতুল খাবাল' কি? তিনি বললেন, জাহান্নামীদের শরীর থেকে নির্গত পূঁজ-রক্ত-রস'।[১২]

এই যদি হয় সাধারণ নেশায় অভ্যস্ত ব্যক্তিদের পরিণতি, তবে ঐ সমস্ত লোকদের পরিণতি কেমন হবে, যারা গুরুতরভাবে নেশার দ্রব্যে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং অবিরতভাবে তা পান করে থাকে।

সোনা-রূপার পাত্র ব্যবহার ও তাতে পানাহারঃ

আধুনিক কালে এমন কোন মহল্লা পাওয়া যাবে না, যেখানে সোনা-রূপার পাত্র অথবা সোনা-রূপার প্রলেপযুক্ত পাত্রাদি নেই। ধনীদের গৃহে এমনকি অনেক হোটেলেও এসব পাত্র পরিবেশন করা হয়। বরং সোনা-রূপার পাত্র প্রদান উত্তম উপহার হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে, যা কিনা লোকেরা নানা পর্ব ও উৎসবে নিজেদের মধ্যে আদান-প্রদান করে থাকে। কেউ কেউ নিজ বাড়ীতে সোনা-রূপার পাত্র রাখে না বটে কিন্তু অন্যের বাড়ীতে 'ওয়ালীমা' ইত্যাদি অনুষ্ঠানে পরিবেশিত সোনা রূপার পাত্র ব্যবহারে কুণ্ঠাবোধ করে না। অথচ নিজ বাড়ীতে হৌক কিংবা অন্যের বাড়ীতে হৌক, শরী'আতে এসব পাত্র হারাম ঘোষিত হয়েছে। এজাতীয় পাত্র ব্যবহারে কঠোর শাস্তির কথা হাদীছে এসেছে। উম্মু সালামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ الَّذِيْ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِيْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِيْ بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ-

'যে ব্যক্তি রূপা ও সোনার পাত্রে খাবে কিংবা পান করবে তার পেটে জাহান্নামের আগুন ঢক ঢক করে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে'।[১৩]

এ বিধান খাবারের পাত্র সহ যেকোন ধরনের সোনা-রূপার পাত্রের জন্য প্রযোজ্য। যেমন- প্লেট, ডিস, কাঁটা চামচ, চামচ, ছুরি, মেহমানদারীর জন্য প্রস্তুত খাদ্য প্রদানের পাত্র, বিবাহ ইত্যাদিতে মিষ্টি প্রভৃতি পরিবেশনের ডালা বা বারকোশ ইত্যাদি।

কিছু লোক শোকেসের মধ্যে সোনা-রূপার পাত্র রেখে বলে, এগুলি আমরা ব্যবহার করি না, কেবল সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য রেখে দিয়েছি। হারামের পথ রুদ্ধ করার জন্য তাদের উক্ত কাজও অনুমোদনযোগ্য নয়।

মিথ্যা সাক্ষ্যদানঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

فَاجْتَنِبُوْا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهِ-

'সুতরাং তোমরা পূঁতিগন্ধ অর্থাৎ মূর্তি, প্রতিমা থেকে দূরে থাক এবং মিথ্যা কথন থেকে দূরে থাক, আল্লাহ্র প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে ও তাঁর সঙ্গে শিরক না করে' *(হজ্জ ৩০-৩১)*।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِى بَكْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ (ثَلاَثًا) اَلْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا- فَقَالَ: أَلاَ وَقَوْلُ الزُّوْرِ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ-

'আবুবাকরা (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মজলিসে ছিলাম। এমন সময় তিনি আমাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আমি কি তোমাদিগকে বৃহত্তম কবিরাগুনাহ সম্পর্কে অবহিত করব না? কথাটি তিনি তিনবার বললেন। (উত্তরে তিনি বললেন) আল্লাহ্র সঙ্গে শিরক করা, মাতা-পিতার আদেশ অমান্য করা। তিনি হেলান দেওয়া অবস্থায় কথাগুলি বলছিলেন। অতঃপর সোজা হয়ে বসে বললেন, শুনে রাখ! আর মিথ্যা বলা। এ কথাটি তিনি অনবরত বলতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত আমরা বলতে লাগলাম, হায়! তিনি যদি চুপ করতেন'।[১৪]

আলোচ্য হাদীছে মিথ্যা সাক্ষ্যের ভয়াবহতা বুঝাতে পুনঃপুনঃ কথাটি বলা হয়েছে। কেননা মানুষ এ বিষয়টিকে হালকাভাবে নিয়ে থাকে। মিথ্যা সাক্ষ্যের পেছনে অনেক

১২. ইবনু মাজাহ হা/৩৩৭৭; ছহীহুল জামে' হা/৬৩১৩।

১৩. মুসলিম ৩/১৬৩৪।

১৪. বুখারী, ফাৎহুল বারী ৫/২৬১ পৃঃ।

কারণও রয়েছে। যেমন শত্রুতা, হিংসা ইত্যাদি। মিথ্যা সাক্ষ্যের ফলে ক্ষয়-ক্ষতিও হয় প্রচুর। মিথ্যা সাক্ষ্যের ফলে কত হক্ব যে বিনষ্ট হয়ে গেছে, কত নির্দোষ লোক যুলুম-নিপীড়নের শিকার হচ্ছে, কত লোক যে যে জিনিসের উপর তাদের কোন অধিকার নেই তাতে অধিকার প্রতিষ্ঠা করছে, কতজন যে বংশের মানুষ নয় সে বংশের সন্তান গণ্য হচ্ছে- তার কোন ইয়ত্তা নেই।

কিছু লোক বিচার ফায়ছালার জন্য অন্য লোককে এই বলে স্বপক্ষে টেনে আনে যে, তুমি আমার পক্ষে অমুক বিষয়ে আদালতে সাক্ষ্য দিবে, তোমার প্রয়োজনে আমিও তোমার পক্ষে সাক্ষ্য দিব। সাক্ষ্য দিতে হ'লে যেখানে ঘটনা প্রত্যক্ষ করা অপরিহার্য সেখানে হয়ত এই লোকটির সঙ্গে তার কোর্টের বারান্দায় কিংবা বাড়ীর দহলিজে মাত্র দেখা হয়েছে। মূল ঘটনার সময় হয়ত সে আদৌ উপস্থিত ছিল না। তা সত্ত্বেও সে তার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করে। তার এই মিথ্যা সাক্ষ্যের ফলে কোন ভূমি কিংবা বাড়ীর মালিকানা প্রকৃত মালিকের হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। কিংবা কোন দোষী ব্যক্তি বেকসুর খালাস পেয়ে যেতে পারে। এসব সাক্ষ্য ডাহা মিথ্যা। সুতরাং না দেখে না জেনে কোন প্রকারেই সাক্ষ্য দেওয়া যাবে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَمَا شَهِدْنَا إِلاَّ بِمَا عَلِمْنَا-

'আমরা যা জানি তার বাইরে সাক্ষ্য দিতে পারি না' *(ইউসুফ ৮১)*।

বাদ্যযন্ত্র ও গানঃ

[গান-বাজনার সঙ্গে পরিচিত নয় এমন মানুষ পাওয়া দুষ্কর। গানের বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। কিন্তু কম্বলের লোম বাছা যেমন কষ্টকর তেমনি অসংখ্য হারাম গানের মধ্য হ'তে দু'একটি হালাল গান বের করাও কষ্টকর। গান দ্বারা যদি আল্লাহ ও রাসূলের প্রশংসা করা হয়, জিহাদের প্রতি অনুপ্রাণিত করা হয়, ইসলামের অনুশাসন মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করা হয়, চরিত্র গঠনের চেষ্টা করা হয়, পাপ-পংকিলতা থেকে নিরুৎসাহিত করা হয়, তাহ'লে বাদ্যযন্ত্র বিহীন এ জাতীয় গান বৈধ হবে। উল্লিখিত ও অনুরূপ বিষয় ছাড়া গান হারাম (নববী, শরহে ছহীহ মুসলিম, তানজীমুল আশতাত, 'ঈদ' অধ্যায় দ্রষ্টব্য) -অনুবাদক]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ-

'মানুষের মাঝে কেউ কেউ এমন আছে, যে আল্লাহ্র রাস্তা (ইসলাম) হ'তে বিচ্যুত করার জন্য অসার কথা খরিদ করে' *(লুক্বমান ৬)*।

ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) আল্লাহ্র কসম করে বলেছেন, উক্ত আয়াতে 'অসার কথা' বলতে গানকে বুঝানো হয়েছে।[১৫]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

لَيَكُوْنَنَّ مِنْ أُمَّتِى أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحِرَّ وَالْحَرِيْرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ-

'অবশ্যই আমার উম্মতের মধ্যে এমন অনেক গোষ্ঠী হবে, যারা স্বাধীন মানুষের কেনা-বেচা, রেশম ব্যবহার, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল গণ্য করবে'।[১৬]

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

لَيَكُوْنَنَّ فِى هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَمَسْخٌ وَذَلِكَ إِذَا شَرِبُوْا الْخُمُوْرَ وَاتَّخَذُوْا الْقَيْنَاتِ وَضَرَبُوْا بِالْمَعَازِفِ-

'অবশ্যই এই উম্মতের মধ্যে মাটির মধ্যে আমূল বসে যাওয়া, দূর ক্ষেপণ বা ঊর্ধ্বে উৎক্ষেপণ জাতীয় গযব ও দৈহিক রূপান্তর দেখা দিবে। এসব তখনই ঘটবে যখন তারা মদ্যপান শুরু করবে, গায়িকা রাখবে ও বাদ্যযন্ত্র বাজাবে'।[১৭]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঢোল-তবলা বাজাতে নিষেধ করেছেন, বাঁশিকে দুষ্ট লোক ও বোকার কণ্ঠস্বর নামে আখ্যায়িত করেছেন।

পূর্বসূরি আলেমগণ যেমন ইমাম আহমাদ (রহঃ) প্রমুখ পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, অসার ক্রীড়া-কৌতুক, গান-বাজনা এবং তাতে ব্যবহৃত যন্ত্রাদি হারাম। যেমন সারেঙ্গী, তানপুরা, রাবার, মন্দিরা, বাঁশি, ফ্লুট বাঁশি, তবলা ইত্যাদি।

আধুনিক বাদ্যযন্ত্রসমূহ নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিষেধ বাণীর আওতায় পড়ে। যেমন- দোতারা, পিয়ানো, গিটার, ম্যাণ্ডেলিন ইত্যাদি। এই যন্ত্রগুলি বরং হাদীছে নিষিদ্ধ তৎকালীন অনেক যন্ত্র থেকে অনেক বেশী মোহ ও তমায়তা সৃষ্টি করে। এমনকি বাদ্যযন্ত্রের নেশা মদের নেশা থেকেও অনেক বড় হয়ে দাঁড়ায়।

আর যদি বাদ্যযন্ত্রের সাথে গান ও সুর সংযোজিত হয় তাহ'লে পাপের পরিধি বেড়ে যাবে, হারামও কঠিন হবে। সেই সাথে গানের কথাগুলি যদি প্রেম-ভালবাসা, রূপচর্চা, যৌন উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী ইত্যাদি বিষয়ে হয় তাহ'লে তো মুছীবতের কোন শেষ নেই।

এ কারণেই আলেমগণ বলেছেন, গান ব্যভিচারের বার্তবাহক এবং অন্তরে কপটতা সৃষ্টিকারী। মোটকথা, বর্তমান কালে গানের কথা, সুর ও বাদ্য এক বিরাট ফিৎনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মিউজিকের এই সর্বগ্রাসী থাবা এখন শুধু গানেই সীমাবদ্ধ নেই; বরং তা ঘড়ি, বেল, ভেঁপু,

১৫. তাফসীরে ইবনু কাছীর ৬/৩৩৩ পৃঃ।

১৬. বুখারী, ফাতহুল বারী ১০/৫১ পৃঃ।
১৭. তিরমিযী হা/২২১২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২২০৩।

শিশুখেলনা, কম্পিউটার ও কোন কোন টেলিফোনের মাঝেও পরিব্যাপ্ত হয়েছে। মনের দৃঢ় সংকল্প না থাকলে এসব থেকে বাঁচা বড় দুষ্কর। –وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ 'আল্লাহই সাহায্যস্থল'।

গীবত বা পরনিন্দাঃ

মুসলমানদের গীবত ও তাদের মান-ইযযতে অহেতুক নাক গলানো এখন একটি জনপ্রিয় বিষয়ে পরিণত হয়েছে। অথচ গীবত করতে আল্লাহ তা'আলা কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। মানুষ যাতে গীবতকে ঘৃণা করে এবং তাতে নিরুৎসাহিত হয় সেজন্য আল্লাহ তা'আলা প্রত্যাদেশ করেছেন। সর্বোপরি তিনি গীবতকে এমন এক দৃশ্যে অঙ্কিত করেছেন, যাতে যে কোন মনই উহার প্রতি ঘৃণায় সংকুচিত হয়ে যাবে। তিনি বলেছেন,

وَلاَيَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ–

'তোমরা একে অপরের যেন গীবত না কর। তোমাদের কেউ কি স্বীয় মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ পসন্দ করে? অনন্তর তোমরা তা অপসন্দ কর' *(হুজুরাত ১২)*।

'গীবত'-এর পরিচয় প্রসঙ্গে নবী করীম (ছাঃ) ছাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বলেছেন,

أَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ– قَالُوْا اَللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ– قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ– قِيْلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِى أَخِىْ مَا أَقُوْلُ؟ قَالَ إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَّمْ يَكُنْ فِيْهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ–

'তোমরা কি জান 'গীবত' কী? তাঁরা বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন, তোমার ভাই যে কথা অপসন্দ করে তার সম্পর্কে সে কথা বলার নাম গীবত। জিজ্ঞেস করা হ'ল, আমি যা বলছি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি যা বলছ তা যদি তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে তবেই তুমি তার 'গীবত' করলে। আর যদি না থাকে তাহ'লে তুমি তাকে অপবাদ দিলে'।[১৮]

সুতরাং মানুষের মধ্যে যে দোষ আছে এবং যার চর্চা সে অপসন্দ করে তা আলোচনা করাই গীবত। চাই সে দোষ তার শরীর সংক্রান্ত হৌক কিংবা দ্বীন ও চরিত্র বিষয়ক হৌক কিংবা আকার-আকৃতি বিষয়ক হৌক। গীবত করার আঙ্গিক বা ধরনও নানারকম রয়েছে। যেমন ব্যক্তির দোষ আলোচনা করা, বিদ্রুপাত্মক ভঙ্গিতে তার কর্মকাণ্ড তুলে ধরা ইত্যাদি।

১৮. মুসলিম ৪/২০০১ পৃঃ।

আল্লাহ পাকের নিকটে গীবত বড়ই কদর্য ও খারাপ কাজ হওয়া সত্ত্বেও মানুষ গীবতের ব্যাপারে খুবই উদাসীনতা দেখিয়ে থাকে। এজন্য গীবতের ভয়াবহতা প্রসঙ্গে নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

اَلرِّبَا إِثْنَانِ وَسَبْعُوْنَ بَابًا أَدْنَاهَا مِثْلُ إِتْيَانِ الرَّجُلِ أُمَّهُ وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا اسْتِطَالَةُ الرَّجُلِ فِى عِرْضِ أَخِيْهِ–

'সূদের (পাপের) ৭২টি দরজা বা স্তর রয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নতম স্তর হচ্ছে স্বীয় মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার তুল্য পাপ এবং ঊর্ধ্বতম স্তর হ'ল কোন ব্যক্তি কর্তৃক তার এক ভাইয়ের মান-সম্ভ্রমের হানি ঘটান তুল্য পাপ'।[১৯]

যে মজলিসে কারও গীবত করা হয় সেখানে যে ব্যক্তিই উপস্থিত থাকুক তাকে তা নিষেধ করা ওয়াজিব। যে ভাইয়ের গীবত করা হয় তার পক্ষ নিয়ে সাধ্যমত তাকে সহযোগিতা করাও আবশ্যক। সম্ভব হ'লে ঐ মজলিসেই গীবতের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيْهِ رَدَّ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ–

'যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের মান-সম্ভ্রমের বিরুদ্ধে কৃত হামলাকে প্রতিহত করবে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার থেকে জাহান্নামের আগুনকে প্রতিহত করবেন'।[২০]

[চলবে]

১৯. সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮৭১।
২০. আহমাদ ৬/৪৫০ পৃঃ; ছহীহুল জামে' হা/৬২৩৮।

এম, এস মানি চেঞ্জার

বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত

বিদেশী মুদ্রা, ডলার, পাউণ্ড, স্টার্লিং, ডয়েস মার্ক, ফ্রেঞ্চ ফ্রাঙ্ক, সুইস ফ্রাঙ্ক, ইয়েন, দীনার, রিয়াল ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় করা হয়। ডলারের ড্রাফট সরাসরি নগদ টাকায় ক্রয় করা হয় ও পাসপোর্ট ডলার সহ এনডোর্সমেন্ট করা হয়।

প্রোঃ মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম
সাহেব বাজার, জিরো পয়েন্ট, রাজশাহী
(ইস্টার্ণ ব্যাংকের পশ্চিমে)
ফোনঃ ৭৭৫৯০২, ফ্যাক্সঃ ৮৮০-০৭২১-৭৭৫৯০২
মোবাইলঃ ০১৭১-৮১৬৫৭৮; ০১৭১-৯৩০৯৬৬।

কবরে তিনটি প্রশ্নঃ মতবাদপন্থী কোন মুসলমানের পক্ষে জবাব দান সম্ভব কি?

মুযাফ্ফর বিন মুহসিন

বনু আদম এই নশ্বর পৃথিবীর সকল মায়ারজ্জু ছিন্ন করে, যাবতীয় স্নেহ-মমতা পরিত্যাগ করে যখন যাত্রা করে অবিনশ্বর জগতপানে- অনন্ত জীবন পথে, তখন তার প্রথম আশ্রয়স্থল হয় গহীন কবর। যা ভীতিপ্রদ, শঙ্কাক্লিষ্ট ও মহা ত্রাসপূর্ণ; আলো-বাতাসহীন এক অন্ধপ্রকোষ্ঠ এবং সঙ্গীহীন চির রুদ্ধ একক ভূগর্ভ। এছাড়া তা হিংস্র ছোবলধারী সর্পগৃহ ও মহাবিপদাত্মক অনলকুন্ড, অনন্তকালের একটি স্থান। স্রষ্টার শাশ্বত বিধানকে পার্থিব জীবনে অবজ্ঞাকারীর জন্য সে এরূপেই সজ্জিত।[১] এতে সংশয়ের লেশমাত্র নেই। কারণ রাসূল (ছাঃ)-এর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে, عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ। 'কবরের আযাব চির সত্য'।[২] তাই সর্বশ্রেষ্ঠ মানব এবং নবী-রাসূলগণের সরদার হওয়া সত্ত্বেও মুহাম্মাদ (ছাঃ)ও কবরের ভয়ে থাকতেন সর্বদা আতঙ্কগ্রস্ত। সেজন্য তিনি প্রতি ছালাতেই আল্লাহ্র নিকটে কবরের আযাব হ'তে পরিত্রাণ চাইতেন। এছাড়া ইসলামের তৃতীয় খলীফা আগাম সুসংবাদপ্রাপ্ত জান্নাতী ছাহাবী ওছমান (রাঃ)ও যখন কবরের পাশে দাঁড়াতেন, তখন ভীতবিহ্বল হয়ে কাঁদতে থাকতেন। এতে তাঁর দাড়ি ভিজে যেত। একদা তাঁকে জিজ্ঞেস করা হ'ল, আপনি জান্নাত-জাহান্নাম-এর কথা স্মরণ করেন অথচ কাঁদেন না, কিন্তু কবর দৃষ্টিগোচর হ'লে কাঁদেন কেন? উত্তরে তিনি বললেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ فَإِنْ نَجَى مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ-

'আখেরাতের যাত্রা পথে যতগুলি মঞ্জিল রয়েছে, তন্মধ্যে কবরই হ'ল প্রথম মঞ্জিল। যদি কেউ এখানে মুক্তি পায়, তাহ'লে পরবর্তী সকল মঞ্জিলই তার জন্য সহজতর হয়ে যায়। আর যদি এখানে মুক্তি না পায়, তাহ'লে পরবর্তী সকল মঞ্জিলই তার জন্য কঠিন হয়ে যায়'।[৩]

ক্ষীণ অবয়বে গঠিত আদম সন্তানকে এই ভয়ংকর অন্ধকূপে রাখার পর পরই মাত্র তিনটি প্রশ্ন করা হয়। উত্তর দানে সক্ষম এমন ব্যক্তি নিঃসঙ্কোচে প্রত্যেকটিরই উত্তর দেয়। ফলে তার জন্য কবর আর কবর থাকে না, জান্নাতের বাগিচায় পরিণত হয়। পক্ষান্তরে যে উত্তর দানে অক্ষম সে একটিরও উত্তর দিতে পারে না। মানব জীবনের নাতিদীর্ঘ সময়ে পালনীয় অগণিত বিষয়ের মধ্যে মাত্র তিনটি বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন প্রকৃতপক্ষেই তাৎপর্যপূর্ণ। তাই এটা সুস্পষ্ট যে, এই তিনটি বিষয়ের মধ্যেই মানব জীবন সম্পূর্ণরূপে পরিব্যাপ্ত। এ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান লাভ করা সহ সার্বিক জীবনে বাস্তবায়ন ছাড়া কি কারো পক্ষে জবাব দান সম্ভব? আলোচ্য নিবন্ধে উক্ত বিষয়ে আলোকপাত করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

প্রথম প্রশ্ন এবং উত্তরঃ

গহীন কবরে আগত ফেরেশতাদ্বয় প্রথম প্রশ্নটি করবেন 'রব' বা প্রতিপালক সম্পর্কে। কে তার প্রতিপালক, কে তার স্রষ্টা? প্রথমেই তাকে রব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার তাৎপর্য হ'ল, রব বা আল্লাহ্ই তাকে অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন, সৃষ্টি করেছেন সুন্দর আকৃতিতে। তিনিই তার প্রতিপালক, অন্নদাতা, তৃষ্ণানিবারণকারী, পরিচালক ও সংরক্ষক। শুধু তাই নয়; তিনি সমস্ত জগতেরও প্রতিপালক। তিনিই কালের স্রষ্টা। কালের আবর্তন-বিবর্তন, শীত-গ্রীষ্মের আগমন-নির্গমন, ঋতুর বৈচিত্র্য, ভূপৃষ্ঠ, ভূগর্ভ এবং সাগরবক্ষের সীমাহীন অজ্ঞাত রহস্য, সৌরমণ্ডল ও মহাশূন্যের বিস্ময়কর লীলা সবকিছু তাঁরই নির্দেশে পরিচালিত হয়ে থাকে। এগুলি তিনি আদম সন্তানের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। উদ্দেশ্য হ'ল এগুলির মাধ্যমে তারা পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান হ'তে। অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দুরূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আঁধারে। এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি জমাট রক্তে, অতঃপর জমাট রক্তকে পরিণত করি পিণ্ডে এবং সেই পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থি-পঞ্জরে; অতঃপর অস্থি-পঞ্জরকে ঢেকে দেই গোশত দ্বারা; অবশেষে তাকে আমি গঠন করি অন্য এক সৃষ্টিরূপে। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান' *(মুমিনূন ১২-১৪)*। মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 'তিনিই পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন' *(বাক্বারাহ ২৯)*। 'হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদত কর, যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা মুত্তাক্বী হ'তে পার; যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আকাশকে ছাদ করেছেন এবং আকাশ হ'তে পানি বর্ষণ করে তার দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন। সুতরাং তোমরা জেনে-শুনে কাউকে আল্লাহ্র সমকক্ষ দাঁড় করাবে না' *(বাক্বারাহ ২১-২২)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَابْتَغِ فِيْمَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ- 'আল্লাহ তা'আলা তোমাকে যা দিয়েছেন তা দ্বারা তুমি আখেরাতের পাথেয়

১. *বিস্তারিত জানার জন্য জুন ২০০৩ইং সংখ্যার 'হাদীছের গল্প' দেখুন।*
২. *বুখারী, মুসলিম, আলবানী, মিশকাত হা/১২৮; মাওলানা নূর মোহাম্মাদ আজমী, বঙ্গানুবাদ মেশকাত ১ম খণ্ড, হা/১২১ 'ঈমান' অধ্যায়, 'কবরের আযাব' অনুচ্ছেদ।*
৩. *তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/১৩২; বঙ্গানুবাদ মেশকাত ১ম খণ্ড, হা/১২৫।*

অনুসন্ধান কর' *(ক্বাছাছ ৭৭)*।

অতএব সেই মহান আল্লাহ সম্পর্কে যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সর্বক্ষেত্রে সম্যকভাবে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে, সে তার প্রতিপালক সম্পর্কে যথাযথ উত্তর দানে সক্ষম হয়। তা হ'ল, (ক) একক প্রতিপালক হিসাবে বিশ্বাস করা (খ) তাঁর নাম সমূহ ও গুণাবলী সহকারে বিশ্বাস করা এবং (গ) একক ইলাহ হিসাবে বিশ্বাস করা। নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে এগুলির আলোচনা করা হ'ল-

(ক) একক প্রতিপালক হিসাবে বিশ্বাসঃ এর অর্থ হ'ল, আল্লাহ তা'আলাকে সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রূযীদাতা, রোগ ও আরোগ্যদাতা, জীবন ও মরণদাতা সকল ক্ষেত্রে একক হিসাবে বিশ্বাস করা। সকল যুগে প্রায় সকল মানুষ উক্ত বিশ্বাস রাখলেও প্রতি যুগেই অনেকে অস্বীকার করে নাস্তিক ও প্রকৃতিবাদী হয়ে গেছে। যাদের মধ্যে নামধারী মুসলমানও রয়েছে। এরা প্রকৃতিকেই সৃষ্টিকর্তা মনে করে। প্রকৃতির কারণেই সবকিছু ঘটছে এবং পরিচালিত হচ্ছে বলে বিশ্বাস করে। আল্লাহ বলেন, তারা বলে, مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ-

'একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন। আমরা এখানেই মৃত্যুবরণ করি ও বেঁচে থাকি। আর প্রকৃতিই আমাদের ধ্বংস করে' *(জাছিয়াহ ২৪)*। তাই তারা স্রষ্টাকে অস্বীকার করা সহ পরকালীন জীবনকে অস্বীকার করে ছোট্ট কথায় বলে থাকে, 'নগদ যা পাও হাত পেতে নাও, বাকির খাতায় শূন্য থাক'।

এরা প্রকৃতপক্ষেই নির্বোধ, অপদার্থ অনুভূতিশূন্য ও বিকৃতমস্তিষ্ক সম্পন্ন মানুষরূপী পশু। এ সমস্ত উন্মাদ-নাস্তিক প্রকৃতিবাদীরা বুঝতে সক্ষম হয় না যে, চিত্রকর ছাড়া চিত্র অসম্ভব, শিল্পী ছাড়া শিল্পকার্য অযৌক্তিক, মিস্ত্রী ছাড়া বিল্ডিং কল্পনাতীত ইত্যাদি। সুতরাং যে বিশ্বভুবনের সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে সুশৃংখলভাবে তার নিয়ন্ত্রক কে? নয়নাভিরাম-দৃষ্টিনন্দন এই প্রকৃতিরইবা স্রষ্টা কে? নিশ্চয়ই একজন আছেন। তিনি হ'লেন মহান সৃষ্টিকর্তা রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তা'আলা। মহান আল্লাহ এদেরকে ধিক্কার দিয়ে বলেন, ضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ 'সে (মানুষ) আমার সম্পর্কে বিভিন্ন বুলি আওড়ায় অথচ তার সৃষ্টির ইতিহাস সে ভুলে যায়' *(ইয়াসীন ৭৭)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'তোমরা কিভাবে আল্লাহ্কে অস্বীকার কর? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, তিনিই তোমাদের প্রাণ দান করেছেন, আবার তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন ও পুনরায় জীবন দান করবেন। পরিণামে তাঁর দিকেই তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে' *(বাক্বারাহ ২৮)*।

তারা তো সবকিছু ভুলে গিয়ে আল্লাহ্কে অস্বীকার করেছে এবং নাস্তিক্যবাদকে বুকে ধারণ করে কমিউনিষ্ট সেজে পূর্বযুগের নমরূদ, ফির'আউন, হামানের উত্তরসূরী কার্লমার্কস (১৮১৮-১৮৮৩ খৃঃ), লেলিন (১৮৭০-১৯২৪ খৃঃ), মাও সেতুং (১৮৯৩-১৯৭৬ খৃঃ) প্রমুখ মোষ্ট নাস্তিকদের আদর্শ গ্রহণ করেছে। কার্লমার্কস মহান স্রষ্টা আল্লাহকে অস্বীকার করে বলেছে, It is not religion that creates man but man who creates religion. Religion is the groan of the down frodden creature. It is the opium... the idea of God must be destroyed. 'ধর্ম মানুষকে সৃষ্টি করেনি, মানুষই ধর্মকে সৃষ্টি করে নিয়েছে। ধর্ম নিপীড়িত মানব গোষ্ঠীর মূর্ত আর্তনাদ! এটা আফিম.... সুতরাং আল্লাহ্র কল্পনা মানুষের মন থেকে উৎখাত করতে হবে'।[৪] এর পরেও কি আল্লাহ্র কোন বান্দা নাস্তিকের পিছনে ছুটতে পারে?

হে নাস্তিক! ইসলামের তাওহীদী মর্মবাণী দ্বারা তোমার মস্তিষ্ক ধৌত কর, খালেছ অন্তরে তওবা কর। অনুধাবন কর অমুসলিম বৈজ্ঞানিক Viscount Samuel -এর দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য। মহান অধিকর্তা আল্লাহ্র অস্তিত্ব সম্পর্কে কত চমৎকারই না মন্তব্য করেছেন তিনি, "Indeed in so far as it accepts and emphasizes the principle of causality and in so far as it perceives that the univers as we see it cannot be self-caused, science leads inveitalby to the conclusion that there must be a casual factor, not comprised within out view of the universe. If this be Deity then science has madw atheism impossible."

অর্থাৎ 'বিজ্ঞান যে সমস্ত কার্যবিধি মেনে চলবে এবং যে পর্যন্ত বুঝতে পারবে যে, এই মহাবিশ্ব আপনা আপনি সৃষ্টি হয়নি, শেষ পর্যন্ত তাকে এই সিদ্ধান্তে আসতেই হবে যে, নিশ্চয়ই ইহার পিছনে এমন একটি আদি শক্তি রয়েছে, যা আমাদের বিশ্বসম্বন্ধীয় দৃষ্টিসীমার বাইরে। এই আদি কারণে যদি কোন দেবতা (আল্লাহ) থাকেন, তবে একথা চির সত্য যে, বিজ্ঞান নাস্তিকতাকে অসম্ভব-অলীক প্রমাণ করেছে'।[৫]

সুতরাং সাম্যবাদ, সমাজতন্ত্র অসংখ্য প্রকৃতিবাদী মতবাদকে বুকে ধারণ করে মুসলমান থাকাই সম্ভব নয়, কবরের উত্তর কোথায়?

এক্ষণে যারা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসী হয়ে উপরোক্ত কার্যসমূহে অন্য কাউকে শরীক করবে, সেও নিঃসন্দেহে শিরক করবে এবং আল্লাহ্র সাথে কুফুরী করবে। সে ব্যক্তিও আল্লাহ সম্পর্কে প্রশ্নে চরমভাবে ব্যর্থ হবে।

(من اعتقد أن أحداً غير الله يتصرف فى هذا الكون و يدبر شئونه فقد أشرك فى الربوبية وكفر بالله)[৬]

৪. *আল্লামা মোহাম্মাদ আবদুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী, আল-ইসলাম বনাম কমিউনিজম (ঢাকাঃ আল-হাদীছ প্রিন্টিং, আগষ্ট ২০০০, পৃঃ ১২।*

৫. *গোলাম মোস্তফা, বিশ্বনবী (ঢাকাঃ আহমাদ পাবলিশিং হাউস, ডিসেম্বর ২০০০), পৃঃ ৩০৮, গৃহীতঃ Belief and action, P. 33.*

৬. *আবূ উসামা হাসান ইবনে আলী আল-আওয়াজী, শারহু নাওয়াক্বিযিত তাওহীদ (১৯৯৩/১৪১৩ হিঃ), পৃঃ ১৫।*

(খ) তাঁর নামসমূহ ও গুণাবলীর প্রতি বিশ্বাসঃ এর অর্থ হ'ল, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহে আল্লাহ্র যে সমস্ত নাম ও গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে, সেগুলির প্রতি শব্দগত, অর্থগত, ব্যাখ্যাগত কোনরূপ পরিবর্তন-পরিবর্ধন ছাড়াই নিঃসঙ্কোচে বিশ্বাস করা।

আল্লাহ্র গুণগত নাম ৯৯টি যা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত।[৭] অনুরূপ মহান আল্লাহ্র যে আকার রয়েছে, এবং তিনি যে নিরাকার নন, কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহে তার অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে।[৮] এছাড়া তিনি যে সপ্তম আকাশের উপরে মহান আরশে সমাসীন, সর্বত্র বিরাজমান নন, তারও অগণিত প্রমাণ রয়েছে।[৯] তবে তিনি যে কেমন তা কেউ জানে না। তিনি তাঁরই মতন। তিনি নিজেই তাঁর পরিচয় দিচ্ছেন এভাবে لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ। 'কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা' *(শূরা ১১)*। ইমাম মালেক (রহঃ) এ বিষয়ে একটি চমৎকার উক্তি পেশ করেছেন। তিনি বলেন, اَلْاِسْتِوَاءُ مَعْلُوْمٌ وَ الْكَيْفُ مَجْهُوْلٌ وَالْإِيْمَانُ بِهِ وَاجِبٌ وَ السُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ– 'সমাসীন' হওয়ার অর্থ স্পষ্ট, কিভাবে (সমাসীন) তা অস্পষ্ট, এর উপরে ঈমান আনা ওয়াজিব এবং এ সংক্রান্ত প্রশ্ন করা বিদ'আত'।[১০]

দুর্ভাগ্য যে, মুসলমানরা আল্লাহ্র নাম সমূহ ও গুণাবলীর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখতেও ব্যর্থ হয়েছে। কোন ফের্কা সমস্ত নামকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছে, কোন ফের্কা কয়েকটি মাত্র স্বীকার করে বাকীগুলি অস্বীকার করেছে। আবার কেউ আল্লাহ্কে নিরাকার ও সর্বত্র বিরাজমান সত্ত্বা মনে করে। এমনতর অসংখ্য ভ্রান্ত আক্বীদা মুসলিম উম্মাহকে গ্রাস করেছে। কুরআন-সুন্নাহ মওজূদ থাকতে আমাদের দেশের অধিকাংশই ভ্রান্ত ফের্কা মু'তাযিলাদের ন্যায় আল্লাহকে নিরাকার মনে করছে। কুরআন-হাদীছে বর্ণিত 'আল্লাহ্র হাত'-এর রূপক অর্থ গ্রহণ করে বলছে 'কুদরতী হাত', 'আল্লাহ্র চেহারা'র অর্থ করছে 'আল্লাহ্র সত্ত্বা' ইত্যাদি। অনুরূপ ভ্রান্ত ফের্কা মু'আত্ত্বিলাদের ন্যায় আল্লাহ্কে সর্বত্র বিরাজমান বলে বিশ্বাস করছে। আল্লাহ আরশে 'সমাসীন'-এর অর্থ করছে 'আরশের মালিক হওয়া'। এরূপ ভ্রান্তিপূর্ণ আক্বীদা পোষণকারীদের ইমাম মালেক (রহঃ) বিদ'আতী বলে ধিক্কার দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

أَهْلُ الْبِدْعِ هُمُ الَّذِيْنَ يَتَكَلَّمُوْنَ فِيْ أَسْمَاءِ اللّٰهِ وَصِفَاتِهِ وَكَلَامِهِ وَعَمَلِهِ وَقُدْرَتِهِ وَلَايَسْكُتُوْنَ عَمَّا سَكَتَ عَنْهُ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُوْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ–

'বিদ'আতী তারাই যারা আল্লাহ্র নাম সমূহ, গুণাবলী, কথা, কার্য ও শক্তি সম্পর্কে বিভিন্ন (রূপক) কথা বলে থাকে এবং যারা সেই সমস্ত বিষয়ে নিরব থাকে না, যে সমস্ত বিষয়ে ছাহাবায়ে কেরাম ও সন্তুষ্টি চিত্তে তাঁদের অনুসরণকারী তাবেঈগণ নীরব থেকেছেন'।[১১]

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন, لَا يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ أَنْ يَّنْطِقَ فِيْ ذَاتِ اللّٰهِ بِشَيْئٍ، بَلْ يَصِفُهُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ وَلَا يَقُوْلُ فِيْهِ بِرَأْيِهِ شَيْئًا– 'আল্লাহ্র সত্ত্বার ব্যাপারে কোন ব্যক্তির রূপক কোন কথা বলা উচিত নয়; বরং তিনি যেভাবে স্বীয় সত্ত্বার বর্ণনা দিয়েছেন সে যেন সেভাবেই বর্ণনা করে। এ সম্পর্কে কেউ যেন নিজের পক্ষ হ'তে কোনরূপ যুক্তি পেশ না করে'।[১২]

(গ) একক ইলাহ বা উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করাঃ এর অর্থ হ'ল, মানুষের সকল প্রকার ইবাদত একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই হওয়া। ত্যাগ-তিতিক্ষা, যবহ-মানত সবই তাঁর জন্য করা। মঙ্গল কামনা এবং অমঙ্গল থেকে পরিত্রাণ চাওয়া, ক্ষমা ভিক্ষা করা, সাহায্য চাওয়া, ভয় করা, আশ্রয় প্রার্থনা করা সবকিছুর অধিকারী একমাত্র তিনিই, অন্য কেউই নয় *(ফাতিহা ৪)*।

মানুষের জীবন মূলতঃ দু'ভাগে বিভক্ত। আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক। আধ্যাত্মিক বলতে ব্যক্তি জীবনে ছালাত, ছিয়াম ইত্যাদি নির্দিষ্ট ইবাদত করাকে বুঝায়। আর বৈষয়িক বলতে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের বিভিন্ন কার্যাবলী বুঝায়। যেমন- চাষাবাদ করা, ব্যবসা-বাণিজ্য করা, চাকরি করা, ডাক্তারী করা, রাজনীতি করা প্রভৃতি। আধ্যাত্মিক জীবনে আল্লাহ কর্তৃক প্রণীত ও রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক প্রদর্শিত সুনির্দিষ্ট নিয়ম-পদ্ধতি অনুযায়ী ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত পালন করাকে যেমন ইবাদত বলা হয়, তেমনি বৈষয়িক জীবনের যাবতীয় কার্যাদি মহান আল্লাহ্র বিধান মোতাবেক পালন করাও ইবাদত।[১৩] আল্লাহ

৭. *রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'উক্ত নামসমূহ যে অনুধাবনসহ নেকীর আশায় গণনা করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'- মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২২৮৭; বঙ্গানুবাদ মেশকাত ৫ম খণ্ড, হা/২১৭৯ 'আল্লাহ্র তা'আলার নাম সমূহ' অধ্যায়।*

৮. *সূরা মায়েদাহ ৪৬, ছোয়াদ ৭৫, ত্ব-হা ৪৬, ৩৯, যুমার ৬৭, ক্বলম ৪২; ছহীহ বুখারী হা/৪৮৪৮-৫০ 'তাফসীর' অধ্যায়, হা/৭৪৪৯ 'তাওহীদ' অধ্যায়; বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫২২-২৪; বঙ্গানুবাদ মেশকাত হা/৫২৮৮-৯০ 'শিঙ্গায় ফুৎকার' অনুচ্ছেদ।*

৯. *ত্ব-হা ৫, আ'রাফ ৫৪, সাজদাহ ৪, হাদীদ ৪, আরো অন্যান্য সূরা দ্রঃ।*

১০. *মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, আল-ক্বাওয়ায়েদুল মুছলা ফী ছিফাতিল্লা-হি ওয়া আসমাইল হুসনা (১৪১২ হিঃ), পৃঃ ৩৭।*

১১. *শারহুস সুন্নাহ, শায়খ সাঊদ ইবনে ইবরাহীম আশ-শারীম, আক্বীদাতুস সালাফিছ ছালেহ (ইত্তাহুলঃ মাকতাবাতুল গুরাবা ১৯৯৭ খৃঃ/১৪১৮ হিঃ), পৃঃ ৫৬।*

১২. *আল্লামা ইবনু আবিল ইযয আল-হানাফী, হাদীছের টীকা সংযোজনঃ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, আক্বীদাতুত তাহাভিয়াহ (কুয়েতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী ১৯৯৬ খৃঃ/১৪১৬ হিঃ), পৃঃ ৩১৩; আক্বীদাতুস সালাফিছ ছালেহ, পৃঃ ৫৭।*

১৩. *ছহীহ তিরমিযী হা/২৪৭১, সনদ হাসান, 'তাফসীর' অধ্যায়, সূরা তাওবাহ ৩১ নং আয়াত দ্রঃ।*

তা'আলা সংক্ষিপ্ত কথায় পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেছেন, 'আমি মানব জাতিকে শুধুমাত্র আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি' *(যারিয়াত ৫৬)*। উক্ত আয়াতে জীবনের কোন একদিককে নির্দিষ্ট করা হয়নি; বরং উভয় জীবনেই ইবাদত করার কথা বলা হয়েছে। অথচ বৈষয়িক ব্যাপারের নামে কেউ রাজনৈতিক জীবনে স্বীয় সৃষ্টিকর্তার আইন ও বিধানের বিরুদ্ধে নিজস্ব আইন ও মূলনীতি রচনা করছে, হারাম সূদকে বৈধ মনে করে বহাল রাখছে, ব্যভিচার, নগ্নতা, বেহায়াপনা, যাবতীয় মাদকতা প্রভৃতি ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডকে সমর্থন দিচ্ছে; সার্বিক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য আইন ও পচা সংস্কৃতিকে বলবৎ রেখে চির নন্দিত মুসলিম সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে নস্যাৎ করছে। কেউ ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতির নামে সূদভিত্তিক নীতিতে গরীব-দুঃখীদের আরো নিঃস্ব করে নিজেরা অর্থের পাহাড় গড়ছে। তারা যেন আল্লাহ্র বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এগুলিতে তাদের হৃদয় কখনো প্রকম্পিত হয় না।

এক্ষণে কেউ যদি তার আধ্যাত্মিক জীবন আল্লাহ্র বিধান মোতাবেক পরিচালনা করে, আর বৈষয়িক জীবন মানব রচিত বিধান মোতাবেক পরিচালনা করে- তাহ'লে সে আধ্যাত্মিক জীবনে ইলাহী বিধানের অনুসারী হ'লেও বৈষয়িক জীবনে সে 'ত্বাগূত'[১৪]-এর অনুসারী। আর এ দ্বিমুখী নীতির ব্যাপারে শরী'আতের সিদ্ধান্ত সুস্পষ্ট যে, ত্বাগূতকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা ছাড়া ইবাদতের কোন মূল্য নেই। কারণ পৃথিবীতে নবী-রাসূল প্রেরণের মৌলিক উদ্দেশ্য হ'ল, আল্লাহ্র ইবাদত থেকে ত্বাগূতকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করা *(নাহল ৩৬)*। সুতরাং মুসলমান কখনো ত্বাগূতকে মা'বূদ হিসাবে গ্রহণ করতে পারে না।

শায়খ আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায (রহঃ) বলেন, كُلُّ مَعْبُوْدٍ رَبٌّ وَكُلُّ مُطَاعٍ وَمُتَّبِعٍ عَلَى غَيْرِ مَا شَرَعَهُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ فَقَدِ اتَّخَذَهُ الْمُطِيْعُ الْمُتَّبِعُ رَبًّا وَ مَعْبُوْدًا–

'বস্তুতঃপক্ষে কারো (রচিত বিধান মোতাবেক) ইবাদত করার অর্থ হ'ল তাকে প্রভু বা 'রব' গণ্য করা। সুতরাং আল্লাহ ও রাসূল প্রবর্তিত বিধানের বিরুদ্ধে রচিত অন্য কোন বিধানের অনুসরণ করা মানেই উক্ত বিধান রচনাকারীদেরকে প্রভু বা উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করা'।[১৫]

আইন রচনাকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوْا لَهُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ– 'তাদের কি এমন কতকগুলি শরীক-দেবতা রয়েছে যারা তাদের (প্রজাদের) জন্য এমন বিধান রচনা করেছে যার অনুমতি আল্লাহ দেননি' *(শূরা ২১)*। উক্ত বিধানের অনুসরণকারীদের হুঁশিয়ার করে আল্লাহ বলেন, وَ إِنْ أَطَعْتُمُوْهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ– 'তোমরা যদি তাদের অনুসরণ কর তাহ'লে অবশ্যই মুশরিক হয়ে যাবে' *(আন'আম ১২১)*।[১৬] ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ) এ সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য করে বলেন,

إِنْ يَّعْلَمُوْا أَنَّهُمْ بَدَّلُوْا دِيْنَ اللهِ فَيَتَّبِعُوْنَهُمْ عَلَى هَذَا التَّبْدِيْلِ فَيَعْتَقِدُوْنَ تَحْلِيْلَ مَا حَرَّمَ اللهُ أَوْتَحْرِيْمَ مَا أَحَلَّ اللهُ اتِّبَاعًا لِرُؤَسَائِهِمْ مَعَ عِلْمِهِمْ أَنَّهُمْ خَالَفُوْا دِيْنَ الرُّسُلِ فَهَذَا كُفْرٌ... وَإِنْ لَمْ يَكُوْنُوْا يُصَلُّوْنَ لَهُمْ وَيَسْجُدُوْنَ لَهُمْ–

'তারা যদি এমর্মে অবগত হয় যে, তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা আল্লাহ্র বিধান পরিবর্তন করেছে, অতঃপর তারা (জনসাধারণ) যদি সেই পরিবর্তিত বিধান অনুযায়ী তাদের আনুগত্য করে, নেতাদের আনুগত্য দেখানোর জন্য আল্লাহ যা হারাম করেছেন তাকে হালাল আর যা হালাল করেছেন তাকে হারাম বলে বিশ্বাস করে এবং তারা যদি এটাও জানে যে, তাদের নেতারা রাসূলগণের প্রবর্তিত পদ্ধতিরও পরিবর্তন করেছে, তাহ'লে এই রচিত বিধানের অনুসরণ করা নিঃসন্দেহে কুফুরী সাব্যস্ত হবে। যদিও তারা তাদের (নেতাদের) জন্য ছালাত না পড়ে সিজদাও করে না'।[১৭] এবার ভেবে দেখুন! আল্লাহদ্রোহী বিধান রচনাকারী ও তার অনুসরণকারীদের ভবিষ্যৎ পরিণতি কি।

তাছাড়া দেখা যায় বৃহত্তর জনগোষ্ঠী আল্লাহ্র নিকট সাহায্য চাওয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করা, আশ্রয় ভিক্ষা করা, মঙ্গলামঙ্গল প্রভৃতির ক্ষেত্রে অন্যকে মাধ্যম সাব্যস্ত করে। তারা কেউ মৃত পীরকে, কেউ মাযার, খানকাহ, কবর, কেউ নির্দিষ্ট স্থান, কেউ গাছপালা, কেউ পুকুর-পুষ্করিণী, জীব-জন্তু বিভিন্ন সৃষ্টিকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছে। আবার এদের মধ্যে এমন প্রকৃতিরও লোক আছে যারা কোন ক্ষেত্রেই দ্বীনি বিধান পালন করে না, কিন্তু আল্লাহকে পেতে চায়। ফলে তারা উক্ত শিরকী আস্তানা সমূহে মানত করে নযর-নেওয়ায দেয় এমনকি সিজদাও করে। জানা আবশ্যক যে, এ সমস্ত ব্যক্তি ও তৎকালীন আরবের মুশরিকদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তারাও এ যুগের মুসলমানদের মত আল্লাহকে বিশ্বাস করত এবং তাঁর নিকট চাওয়া-পাওয়ার ক্ষেত্রে মূর্তি, দেবতা, গাছ, পাথর ইত্যাদিকে মাধ্যম সাব্যস্ত করত। আল্লাহ বলেন,

---

১৪. কুরআন-সুন্নাহ ব্যতিরেকে অন্য কোন বাতিলপন্থীর নিকট থেকে শরী'আতের কোন বিষয়ে ফায়ছালা গ্রহণ করাকে 'ত্বাগূত' বলে- দ্রঃ ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম (বৈরুতঃ দারুল মা'রেফাহ তাবি), ১/৫৩১ পৃঃ, সূরা নিসা আয়াত নং ৬০।

১৫. শায়খ আবদুর রহমান ইবনে হাসান আলে শায়েখ, ফাৎহুল মাজীদ শারহু কিতাবিত তাওহীদ, তা'লীকুঃ শায়খ আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায, পৃঃ ১০২।

১৬. ছহীহ তিরমিযী হা/২৪৭১, সনদ হাসান।

১৭. ফাৎহুল মাজীদ, পৃঃ ১০২।

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُوْنَا إِلَى اللهِ زُلْفَى-

'যারা আল্লাহ্র পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারা বলে 'আমরা তো এদের পূজা এজন্যই করি যে, এরা আমাদের আল্লাহ্র সান্নিধ্যে পৌঁছিয়ে দিবে' *(যুমার ৩)*।

সুতরাং যারা মহাপরাক্রমশীল আল্লাহ্র ক্ষমতাকে সংকীর্ণ ভেবে, তাঁর মহান মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করে উক্ত মাধ্যম নিয়ে ব্যস্ত, তাদের পরিণতি সম্পর্কে বলার প্রয়োজন আছে কি? এগুলি 'শিরকে আকবার', যার পরিণাম চিরস্থায়ী জাহান্নাম।

আশা করি উপরোক্ত তিনটি দিক আলোচনার মাধ্যমে আল্লাহ্র প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনের বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। তাই আল্লাহ যেমন মহান সত্ত্বা তেমনি তাঁর সম্পর্কে বান্দাকে অতি স্বচ্ছ-নিষ্কলুষ ধারণা রাখতে হবে এবং আল্লাহদ্রোহী মানব রচিত সকল আইন ও বিধান, পথ ও মতকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে নিজের আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাঁরই প্রেরিত বিধান বাস্তবে রূপ দিতে হবে। মূলতঃ এটাই কালেমা ত্বাইয়েবাহ لا إله إلا الله ('আল্লাহ ছাড়া কোন প্রকৃত মা'বূদ নেই')-এর প্রতি অকাট্যভাবে বিশ্বাস করা। এ বিশ্বাস যার থাকবে সে নিঃসঙ্কোচে আল্লাহ সম্পর্কে কবরের প্রশ্নের উত্তরে বলবে, رَبِّيَ اللهُ 'আমার প্রতিপালক আল্লাহ'। অন্যথায় সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হবে।

[চলবে]

ঝলক জুয়েলার্স

প্রোঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান

আধুনিক রুচিসম্মত স্বর্ণ রৌপ্য অলঙ্কার প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী।

সাহেব বাজার, রাজশাহী।

ফোনঃ দোকানঃ ৭৭৩৯৫৬
বাসাঃ ৭৭৩০৪২

আরবী সাহিত্যে প্রভাব বিস্তারে হাদীছের ভূমিকাঃ একটি সমীক্ষা

*নূরুল ইসলাম**

উপক্রমণিকাঃ

কুরআন মাজীদ যেমন আরবী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ, তেমনি হাদীছও। হাদীছের শব্দাবলী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিজের হওয়ায় বালাগাত ও ফাছাহাতের দিক থেকে উহার স্থান যেমন কুরআনের পরে, তেমনি আরবী সাহিত্যে প্রভাব বিস্তারেও হাদীছের ভূমিকা কুরআনের পরে।[১] আরবী ভাষাকে সুষমামণ্ডিত করে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে কুরআনের পাশাপাশি হাদীছও পালন করেছে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাকপ্রতিভা ও ভাষার বিশুদ্ধতাঃ

হাদীছের শব্দাবলী যেহেতু রাসূল (ছাঃ)-এর নিজের সেহেতু তাঁর বাকপ্রতিভা ও ভাষার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হ'ল, যাতে আরবী সাহিত্যে হাদীছের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন তদানীন্তন আরবের শ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধভাষী। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন, أَنَا أَفْصَحُ الْعَرَبِ، بَيْدَ أَنِّى قُرَيْشٌ وَنَشَأْتُ فِىْ بَنِى سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ- 'আমি আরবের মধ্যে সবচেয়ে শুদ্ধভাষী। কারণ আমি কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেছি এবং বনু সা'দ বিন বকর গোত্রে প্রতিপালিত হয়েছি'।[২]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভাষার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে আবূবকর (রাঃ) বলেন, لَقَدْ طُفْتُ فِى الْعَرَبِ وَسَمِعْتُ فُصَحَائَهُمْ فَمَا سَمِعْتُ أَفْصَحَ مِنْكَ فَمَنْ أَدَّبَكَ (أَىْ عَلَّمَكَ)؟ فَقَالَ عليه الصلاة والسلام: أَدَّبَنِىْ رَبِّىْ فَأَحْسَنَ تَأْدِيْبِىْ-

'আমি সমগ্র আরবে পরিভ্রমণ করেছি এবং তাদের বিশুদ্ধভাষীদের কথা শুনেছি। কিন্তু আপনার চেয়ে বিশুদ্ধ ভাষা বলতে কাউকে শুনিনি। কে আপনাকে শিখিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমার প্রভূ আমাকে শিক্ষা

* *১ম বর্ষ, আল-হাদীছ এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।*

১. *আহমাদ আল-হাশেমী, জাওয়াহিরুল আদব (কায়রোঃ আল-মাকতাবাতুত তিজারিইয়াহ আল-কুবরা, তাবি), ২/১৩৮ পৃঃ।*

২. *মোস্তফা ছাদেক্ব আর-রাফেঈ, তারীখুল আদাবিল আরাব (বৈরুতঃ দারুল কিতাব আল-আরাবী, ২য় সংস্করণঃ ১৩৯৪হিঃ/১৯৭৪খৃঃ), ২/২৮৫ পৃঃ।*

দিয়েছেন। ফলে আমার শিক্ষা সুন্দর হয়েছে'।[৩]

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলল, يا رسول الله ! مَا أَفْصَحَكَ، مَا رَأَيْنَا الَّذِىْ هُوَأَعْرَبُ مِنْكَ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: حَقٌّ لِّىْ فَإِنَّمَا أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَيَّ بِلِسَانٍ عَرَبِىٍّ مُبِيْنٍ–

'হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আপনি খুব শুদ্ধভাষী! আমরা আপনার চেয়ে আর কাউকে এত বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলতে দেখিনি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এ যে আমার অধিকার। কারণ আমার উপর সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে'।[৪]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভাষাশৈলী সম্পর্কে ভাষাবিদ আল-জাহিয বলেন, هُوَالْكَلَامُ الَّذِىْ قَلَّ عَدَدُ حُرُوْفِه وَكَثُرَتْ مَعَانِيْه... وَاسْتَعْمَلَ الْمَبْسُوْطَ فِىْ مَوْضِعِ الْبَسْطِ وَالْمَقْصُوْرَ فِىْ مَوْضِعِ الْقَصْرِ... وَلَمْ يَتَكَلَّمْ إِلاَّ بِكَلَامٍ قَدْ حَفَّ بِالْعِصْمَةِ وَشَيَّدَ بِالتَّأْيِيْدِ وَيَسَّرَ بِالتَّوْفِيْقِ– 'তাঁর ভাষাশৈলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল অল্প কথায় বেশী ভাব প্রকাশ। তিনি দীর্ঘতার স্থানে দীর্ঘ এবং হ্রস্বতার স্থানে হ্রস্ব বাক্য ব্যবহার করতেন। তিনি এমন বাক্যে কথা বলতেন যা নিষ্কলুষতা দ্বারা আবৃত, সমর্থন দ্বারা সুদৃঢ় এবং ক্ষমতা দ্বারা সহজ করা হয়েছে'।[৫]

নাদওয়াতুল ওলামা লক্ষ্ণৌর রেক্টর মুহাম্মাদ আররাবী নাদভী বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাহিত্য হচ্ছে সাবলীল গদ্য, নতুনত্বে পরিপূর্ণ, যা হযম করা সহজ। যার উৎসস্থল সুপেয়। এটি অল্প কথায় অধিক অর্থ প্রকাশ করে। এটি স্থান-কাল-পাত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি যেখানে সংক্ষেপ হওয়া প্রয়োজন সেখানে সংক্ষিপ্ত, যেখানে বিস্তৃতির প্রয়োজন সেখানে বিস্তৃত। সেখানে কোন কৃত্রিমতা নেই; বরং এটি তাঁর হৃদয় থেকে নিঃসৃত। তিনি দুর্বোধ্য ও শ্রুতিকটু শব্দ বর্জন করেছেন, আর সাহিত্যের রস নেই এমন সাধারণ বাক্যকে পরিহার করেছেন'।[৬]

ডঃ মুহাম্মাদ খলীফা বলেন, 'তাঁর [রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর] শব্দাবলী নতুন। সূক্ষ্ম অর্থ বহনকারী। তাঁর বাক্যবিন্যাস বিশুদ্ধতার শীর্ষে। উপমার প্রয়োগ, বাক্যের অলংকার, পরোক্ষার্থে শব্দের ব্যবহার প্রভৃতি খুবই মনোহারী'।[৭]

আরবী সাহিত্যে হাদীছের প্রভাব বিস্তারের দিকসমূহঃ

১. আরবী ভাষার ঐক্য ও স্থায়িত্বঃ জাহেলী সমাজে আরবীয় গোত্রগুলির মাঝে বিভিন্ন উপভাষা প্রচলিত ছিল। এক গোত্রের সাথে অন্য গোত্রের ভাষার উচ্চারণগত পার্থক্য ছিল। কুরআন মাজীদ এসব উপভাষার মাঝে পার্থক্য দূর করে একটিকে অন্যটির কাছাকাছি নিয়ে এসে আরবী উপভাষা সমূহের মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে আরবী ভাষাকে স্থায়িত্ব দানে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে হাদীছ সহায়ক ও পরিপূরকের ভূমিকা পালন করেছে।[৮]

২. আরবী ভাষার বিস্তারঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছিলেন,

فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ–

'যারা এখানে উপস্থিত আছে তারা যেন অনুপস্থিতদের কাছে আমার বাণীগুলি পৌঁছিয়ে দেয়। কারণ ঐ অনুপস্থিতদের কেউ কেউ উপস্থিতদের চেয়ে বেশী সচেতন হবে'।[৯]

এর ফলে দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর ছাহাবায়ে কেরাম ইসলামী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন। তাঁরা যখন যেখানে যেতেন সেখানেই কুরআন-সুন্নাহ্‌র প্রচার ও প্রসার ঘটাতেন। ছাহাবায়ে কেরামের পর তাবেঈনে এযাম পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে হাদীছের বাণী পৌঁছিয়ে দেন। এভাবে অব্যাহতগতিতে হাদীছের প্রসারের সাথে সাথে আরবী ভাষাও দিক-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে।

ডঃ শাওকী যাইয়িফ যথার্থই বলেছেন,

وَيُمْكِنُ أَنْ نُّلَاحِظَ أَثَرَهُ فِىْ أَنَّهُ عَاوَنَ الْقُرْآنَ الْكَرِيْمِ فِى انْتِشَارِ الْعَرَبِيَّةِ وَفِىْ حِفْظِهَا وَبَقَائِهَا–

'আরবী ভাষা সম্প্রসারণ, সংরক্ষণ ও স্থায়িত্ব দানের ক্ষেত্রে কুরআনের সহায়তাকারী হিসাবে হাদীছের প্রভাব লক্ষণীয়'।[১০]

৩. শব্দ ভাণ্ডার বৃদ্ধিঃ

হাদীছে নববী অনেক নতুন শব্দ বৃদ্ধি করে আরবী ভাষার ভাণ্ডারকে ফুলে-ফলে সুশোভিত করে এক বিরাট মহীরুহের আকার ধারণ করাতে সহায়তা করে। এ প্রসঙ্গে اَلصُّنْرُ (ছিদ্র) শব্দের কথা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। হাদীছে এসেছে-

৩. তদেব, ২/২৯৩ পৃঃ।

৪. ডঃ মুহাম্মাদ আছ-ছাববাগ, আল-হাদীছুন-নববীঃ মুছতলাহুহু, বালাগাতুহু, কুতুবুহু (বৈরুতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৪র্থ সংস্করণঃ ১৪০২ হিঃ/১৯৮২ খৃঃ), পৃঃ ৫৪।

৫. তদেব, পৃঃ ৫১।

৬. মোশাররফ হোসেন খান, প্রবন্ধঃ সাহিত্য-সভ্যতা বিকাশে রাসূল (সা), অগ্রপথিক, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, জুলাই ২০০৩, পৃঃ ৫৩।

৭. তদেব।

৮. ইবরাহীম আলী আবুল খাশাব ও আবদুল মুনঈম খাফাজী, তুরাছুনাল আদাবী (কায়রোঃ দারুত তিবা'আহ আল-মুহাম্মাদিইয়া, তাবি), পৃঃ ১৫৬।

৯. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৬৫৯ 'কুরআনীর দিন ভাষণ' অনুচ্ছেদ, 'হজ্জ' অধ্যায়।

১০. ডঃ শাওকী যাইয়িফ, তারীখুল আদাবিল আরাবী, ২য় খণ্ড, আল-'আছরুল ইসলামী (কায়রোঃ দারুল মা'আরিফ, তাবি), পৃঃ ৪০।

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا أَتَى نَعْيُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَجَعْفَرِ ابْنِ أَبِيْ طَالِبٍ، وَعَبْدِ اللّهِ بْنِ رَوَاحَةَ، جَلَسَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرَفُ فِيْهِ الْحُزْنُ، وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ يَبْكِيْنَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "انْطَلِقْ فَانْهَهُنَّ" فَانْطَلَقَ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: قَدْ نَهَيْتُهُنَّ، فَأَبَيْنَ أَنْ يُنْتَهِيْنَ؟ فَقَالَ: "انْطَلِقْ فَانْهَهُنَّ" فَانْطَلَقَ، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: قَدْ نَهَيْتُهُنَّ، فَأَبَيْنَ أَنْ يُنْتَهِيْنَ! قَالَ: "فَانْطَلِقْ، فَاحْثُ فِيْ أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ أَرْغَمَ اللّهُ أَنْفَ الْأَبْعَدِ، إِنَّكَ- وَاللّهِ مَا تَرَكْتَ رَسُوْلَ اللّهِ، وَمَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ-

'আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন যায়েদ বিন হারেছা, জা'ফর বিন আবূ ত্বালেব ও আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ)-এর মৃত্যু সংবাদ পৌঁছল, তখন রাসূল (ছাঃ) বসেছিলেন। তাঁর চেহারায় চিন্তার ছাপ ফুটে উঠেছিল। আমি দরজার 'ছিদ্র' দিয়ে দেখছিলাম। ইত্যবসরে একজন লোক এসে বলল, জা'ফরের স্ত্রীরা কাঁদছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি গিয়ে তাদেরকে (কাঁদতে) নিষেধ কর। লোকটি চলে গেল। অতঃপর সে ফিরে এসে বলল, আমি তাদেরকে নিষেধ করলাম, কিন্তু তারা ক্রন্দন বন্ধ করল না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি গিয়ে তাদেরকে নিষেধ কর। লোকটি চলে গেল। অতঃপর ফিরে এসে বলল, আমি তাদেরকে নিষেধ করলাম। কিন্তু তারা ক্রন্দন বন্ধ করল না। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এবার গিয়ে তাদের মুখমণ্ডলে ধূলা ছুড়ে মার। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি তখন বললাম, আল্লাহ্‌র রহমত থেকে বঞ্চিত ব্যক্তির নাক আল্লাহ ধূলায় ধুসরিত করুন। আল্লাহ্‌র কসম! তুমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ছাড়ছ না আর নিজেও কিছু করতে পারছ না'।[১১]

এ ধরনের বহু শব্দ হাদীছে নববীতে বিদ্যমান রয়েছে।

৪. আরবী ভাষা মার্জিতকরণঃ

জাহেলী যুগে অপ্রচলিত, বিদঘুটে, জটিল ও কঠিন শব্দের প্রচলন ছিল। হাদীছে নববী এতদস্থলে সহজ, সাবলীল, সুস্পষ্ট শৈলীযুক্ত শব্দের প্রচলন করে আরবী ভাষাকে মার্জিত ও রুচিসম্মত ভাষায় পরিণত করেছে।[১২]

৫. বিভিন্ন শাস্ত্রের উদ্ভবঃ

হাদীছকে কেন্দ্র করে আরবী গদ্যে বিভিন্ন শাস্ত্রের উদ্ভব ঘটে। K. A. Fariq বলেন, "Round the hadith a large prose literature grew in later years".[১৩]

হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুদ্ধ-বিগ্রহ, আচার-আচরণ, দৈহিক অবয়ব এক কথায় তাঁর জীবনের নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিদ্যমান থাকায় তাঁর জীবনকেন্দ্রিক 'সীরাত' সাহিত্যের উদ্ভব ঘটে। পরবর্তীতে এর পথ ধরে ইসলামের ইতিহাস রচনার দ্বার উন্মুক্ত হয়। ডঃ শাওকী যাইয়িফ বলেছেন,

فَالْحَدِيْثُ هُوَالَّذِيْ فَتَحَ بَابَ الْكِتَابَةِ التَّارِيْخِيَّةِ وَهَيَّأَ لِظُهُوْرِ كُتُبِ الطَّبَقَاتِ فِيْ كُلِّ فَنٍّ-

'হাদীছ-ই ইতিহাস লেখার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয় এবং প্রত্যেক বিষয়ে পণ্ডিত শ্রেণীর জীবনী গ্রন্থ প্রকাশের পথ তৈরী করে দেয়'।[১৪]

'আসমাউর রিজালে' (রাবীদের জীবনী), ইলমুল জারহু ওয়াত-তা'দীল (হাদীছ সমালোচনা সাহিত্য), ইলমু গারীবিল হাদীছ প্রভৃতি হাদীছকেন্দ্রিক শাস্ত্র সৃষ্টিতে হাদীছে নববী অনন্য ভূমিকা পালন করে।

ডাঃ স্প্রেঙ্গার বলেন, "There is no nation, nor has there been any which like them has during twelve centuries recorded the life of every man of letters". অর্থাৎ 'পৃথিবীতে বর্তমান যুগে এমন কোন জাতি নেই, অথবা অতীত যুগেও এরূপ কোন জাতি ছিল না, যারা মুসলমানদের ন্যায় দীর্ঘ দ্বাদশ শতাব্দীর প্রত্যেক বিদ্বান, সাহিত্যিক, লেখক প্রমুখের জীবন চরিত লিপিবদ্ধ করে রাখতে সমর্থ হয়েছে'।[১৫]

ডঃ মোস্তফা আস-সাবাঈ বলেন, هُمْ أَوَّلُ مَنْ وَضَعُوْا قَوَاعِدَ النَّقْدِ الْعِلْمِيِّ الدَّقِيْقِ لِلْأَخْبَارِ وَالْمَرْوِيَّاتِ بَيْنَ أُمَمِ الْأَرْضِ كُلِّهَا، وَإِنَّ جُهْدَهُمْ فِيْ ذَلِكَ جُهْدٌ تَفَاخَرَ بِهِ الْأَجْيَالُ وَتَتِيْهُ بِهِ عَلَى الْأُمَمِ-

'পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে প্রথম তারাই (মুসলমানরা) তথ্য ও বর্ণনাবলীর জন্য সমালোচনার সূক্ষ্ম ইলমী নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। এক্ষেত্রে তাদের কর্মপ্রচেষ্টা নিয়ে প্রজন্মের পর প্রজন্ম অন্যান্য জাতির উপর গর্ববোধ করবে'।[১৬]

---

১১. *ছহীহ নাসাঈ, তাহক্বীক্বঃ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রিয়াযঃ মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১৪১৯ হিঃ/ ১৯৯৮ খৃঃ), হা/১৮৪৬ 'জানাযা' অধ্যায়, 'মৃত ব্যক্তির জন্য ক্রন্দন নিষিদ্ধ' অনুচ্ছেদ।*

১২. *তুরাছুনাল আদাবী, পৃঃ ১৫৫।*

১৩. *K.A. Fariq, History of Arabic Literature (Delhi: Vikas publication, 1972), p. 133.*

১৪. *আল-'আছরুল ইসলামী, পৃঃ ৪১।*

১৫. *মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মোস্তফা চরিত (ঢাকাঃ কাকলী প্রকাশনা, ২০০০), পৃঃ ২৩।*

১৬. *ডঃ মোস্তফা আস-সাবাঈ, আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফিত-তাশরীঈল ইসলামী (বৈরুতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৪র্থ সংস্করণঃ ১৪০৫ হিঃ/১৯৮৫ খৃঃ), পৃঃ ৯০।*

হাদীছ না থাকলে এসকল শাস্ত্রের উৎপত্তি হ'ত না। ডঃ মুহাম্মাদ আছ-ছাববাগ যথার্থই বলেছেন,

بَلْ أَنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْعُلُوْمِ مَا كَانَ لَيُوْجَدُ لَوْلاَ الْحَدِيْثُ، فَطَبَقَاتُ الرِّجَالِ وَكُتُبُ التَّارِيْخِ وَكُتُبُ التَّرَاجِمِ وَالسِّيْرَةِ كُلُّ هَذِهِ ثَمَرَةٌ مِنْ ثَمَرَاتِ الْحَدِيْثِ النَّبَوِيِّ-

'নিশ্চয়ই হাদীছ না থাকলে অনেক বিদ্যারই উৎপত্তি হ'ত না। রাবীদের জীবনীকোষ, ইতিহাসের গ্রন্থাবলী, জ্ঞানী-গুণীদের জীবনী গ্রন্থ এবং সীরাত সাহিত্য এগুলি সবই হাদীছে নববীর ফল'।[১৭]

৬. আরবী বক্তৃতায় প্রভাবঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বাগ্মিতার জন্য অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিলেন। প্রয়োজনানুযায়ী সঠিক শব্দ চয়ন ও সংযোজনের মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন বাক্যবিন্যাসের ক্ষমতা ছিল তাঁর অসাধারণ। তৎকালীন আরবে প্রচলিত সর্বপ্রকার ভাষারীতি অনুধাবন এবং যেকোন প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে তার যথাযথ প্রয়োগের এক দুর্লভ ক্ষমতা তাঁকে প্রদান করা হয়েছিল। কাজেই আরবের যেকোন গোত্রের ভাষা অনুধাবন এবং অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে তা ব্যবহার করতে তিনি সক্ষম হ'তেন। একদিকে প্রত্যন্ত মরু অঞ্চলের বেয়াড়া বেদুঈনদের সঙ্গে যেমন তিনি অত্যন্ত সঙ্গত পন্থায় ভাব বিনিময় করতে এবং বক্তব্য পেশ করতে সক্ষম হ'তেন, অন্যদিকে তেমনি নগরবাসী আরবদের সঙ্গে অত্যন্ত উন্নত ও মার্জিত ভাষায় কথোপকথন ও বক্তব্য পেশ করতে সক্ষম হ'তেন।[১৮] পরবর্তীতে বাগ্মীদের উপর এর সুদূর প্রসারী প্রভাব পড়ে।

৭. আরবী প্রবাদের বিস্তৃতিঃ

একটি আরবী প্রবাদে আছে خَيْرُ الْكَلاَمِ مَا قَلَّ وَ دَلَّ 'সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ কথাই হ'ল সর্বোত্তম কথা'।[১৯]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন এ প্রবাদের মূর্তপ্রতীক। তিনি যেন ভাষার হৃদয়ে স্বীয় হস্তদ্বয় স্থাপন করা মাত্র তা আন্দোলিত হ'ত। খরস্রোতা নদীর পানির মত অমনি অবলীলাক্রমে তার মুখ থেকে বের হ'ত সারগর্ভ বাণী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজেই বলেছেন, بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ 'আমি সারগর্ভ বাণীসহ প্রেরিত হয়েছি'।[২০]

তাঁর এধরনের অনেক বাণী মানুষের মাঝে প্রবাদ বাক্যরূপে প্রচলিত আছে। যেমন-

১. হুনাইনের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছিলেন, هَذَا حِيْنَ حَمِيَ الْوَطِيْسُ 'চুলো এখন ভীষণ উত্তপ্ত'।[২১] যুদ্ধ ভয়ানক আকার ধারণ করলে আরবীতে এ প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়।[২২] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-ই প্রথম এ বাক্যটি ব্যবহার করেন।[২৩]

২. إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا 'নিশ্চয়ই কতক বক্তৃতায় যাদু রয়েছে'।[২৪]

৩. إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً 'নিশ্চয়ই কতক কবিতায় জ্ঞানের কথা রয়েছে'।[২৫]

৪. لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ 'এক গর্তে মুমিন দু'বার দংশিত হয় না'।[২৬]

৫. اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلَى 'ডান হাত বাম হাতের চেয়ে উত্তম'।[২৭]

৬. مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ 'এই মাত্র তার জীবনাবসান হয়েছে'।

আলী (রাঃ)-এ বাক্য সম্পর্কে বলেন,

مَا سَمِعْتُ كَلِمَةً عَرَبِيَّةً مِّنَ الْعَرَبِ إِلاَّ وَسَمِعْتُهَا مِنْ رَّسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ (مات حتف انفه) وَمَا سَمِعْتُهَا مِنْ عَرَبِيٍّ قَبْلَهُ-

'একটি বাক্য আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যতীত কোন আরবীভাষীর কাছ থেকে শুনিনি। (সেটি হ'ল) আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, (مات حتف أنفه) 'তার জীবনাবসান হয়েছে'। তার পূর্বে কোন আরবীভাষীর কাছ থেকে এ বাক্যটি শুনিনি।[২৮]

উপসংহারঃ

পরিশেষে বলা যায়, আরবী সাহিত্যে হাদীছের প্রভাব অপরিসীম। হাদীছের প্রভাবে আরবী ভাষা মার্জিত ভাষায় পরিণত হয়। হাদীছ না থাকলে অনেক বিদ্যার অস্তিত্ব কখনো কল্পনা করা যেত না।

---

১৭. *আল-হাদীছুন-নববী, পৃঃ ১৬।*
১৮. *ছফিউর রহমান মুবারকপূরী, আর-রাহীকুল মাখতূম (রিয়াযঃ মাকতাবা দারুস সালাম, ১৯৯৩), পৃঃ ৪৮৪।*
১৯. *লুইস মা'লূফ, আল-মুনজিদ ফিল-লুগাহ (বৈরুতঃ দারুল মাশরিক, ৩৫তম সংস্করণঃ ১৯৯৮ খৃঃ), পৃঃ ৯৮৫।*
২০. *ছহীহ বুখারী (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, তাবি), ৮/৪৮৮ পৃঃ, হা/৭২৭৩ 'কুরআন ও সুন্নাহ্কে আঁকড়ে ধরা' অধ্যায়।*
২১. *মুসলিম হা/৪৫৮৮, 'জিহাদ ও সফরের বর্ণনা' অধ্যায়, 'হুনাইনের যুদ্ধ' অনুচ্ছেদ।*
২২. *ইমাম নববী, আল-মিনহাজ শারহু মুসলিম (বৈরুতঃ দারুল মা'রেফাহ, ৩য় সংস্করণঃ ১৪১৭ হিঃ/১৯৯৬), ১২তম খণ্ড, পৃঃ ৩৩৩।*
২৩. *ডঃ ফযল হাসান আব্বাস, আল-বালাগাতু ফুনূনুহা ওয়া আফনানুহা, ইলমুল বায়ান ওয়াল বাদী (আম্মানঃ দারুল ফুরক্বান, ৭ম সংস্করণঃ ১৪২১ হিঃ/২০০০ খৃঃ), পৃঃ ২২৭।*
২৪. *বুখারী, মিশকাত হা/৪৭৮৩ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'বক্তৃতা ও কবিতা' অনুচ্ছেদ।*
২৫. *বুখারী, মিশকাত হা/৪৭৮৪।*
২৬. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ; মিশকাত হা/৫০৫৩, ঐ অধ্যায়, 'সবকাজে সাবধানতা ও ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা' অনুচ্ছেদ।*
২৭. *মুসলিম হা/২৩৮২ 'যাকাত' অধ্যায়।*
২৮. *মোস্তফা ছাদেক আর-রাফেঈ, প্রাগুক্ত, ২/৩১৬ পৃঃ।*

নারী-পুরুষের সৃষ্টি রহস্য

*মাস'উদ আহমাদ**

(শেষ কিস্তি)

নারী-পুরুষের জন্ম রহস্যঃ

আমাদের সমাজে পুত্র সন্তানের সমাদর অত্যধিক, যা প্রতিনিয়তই দৃষ্টিগোচর হয়। পুত্র সন্তান জন্মকে আমরা সৌভাগ্যের প্রতীক, সফলতার প্রধান উৎস হিসাবে গণ্য করি। আর কন্যা সন্তান আমাদের কাছে সমাদর লাভ থেকে বঞ্চিত হয়। কন্যা সন্তান জন্মদানকারী পিতার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। স্ত্রী বারবার কন্যা শিশু প্রসব করার কারণে নানা প্রকার নির্যাতনের শিকার হয়। অনেক সময় স্ত্রীকে অকথ্য ভাষায় গালি দেওয়া হয়। এমনকি কন্যা সন্তান প্রসবের অপরাধে (?) ঠাণ্ডা মাথায় স্ত্রীকে খুনও করা হয়।

বস্তুতঃ পুত্র বা কন্যা সকল শিশুই আল্লাহ্র নির্দেশে ভূমিষ্ঠ হয়। এতে মানুষের কোন এখতিয়ার নেই। আল্লাহ বলেন, 'আসমান ও যমীনের সর্বময় কর্তৃত্ব আল্লাহ্র। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন; যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা যাদেরকে ইচ্ছা পুত্র ও কন্যা উভয়ই দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন' *(শূরা ৪৯-৫০)*।

নারী ও পুরুষের বীর্য শক্তির তারতম্য ও একটির সাথে আরেকটির প্রাধান্য বিস্তারের উপর নির্ভর করে সন্তান পুত্র/কন্যার আকৃতি ধারণ করে থাকে। এ সম্পর্কে ছহীহ মুসলিম শরীফে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়-

'স্ত্রীগর্ভে পুরুষের বীর্য নারী বীর্যের উপরে প্রাধান্য লাভ করলে পুত্র সন্তান জন্ম নেয়। আর স্ত্রীর বীর্য পুরুষের বীর্যের উপর প্রাধান্য লাভ করলে কন্যা সন্তান জন্মলাভ করে'।[৫]

সৃষ্টির মাহাত্ম্য ও বৈচিত্র্যে নারী-পুরুষঃ

মহান আল্লাহ্র সৃষ্টিলীলা বড় বিচিত্র। কেবল নির্দিষ্ট কিছু অঙ্গ-প্রতঙ্গের পার্থক্য নয়; বরং নারী-পুরুষের সৃষ্টিতে বহু বিস্ময় বিদ্যমান। নারী ও পুরুষকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি মানুষকে অতি উৎকৃষ্ট আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি' *(ত্বীন ৪)*। আবার অন্যত্র তিনি বলেছেন, 'তাঁর (আল্লাহ) নিদর্শনাবলীর মধ্যে অন্যতম এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি লাভ কর এবং তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া। নিশ্চয়ই এতে ঐসব লোকের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যারা গভীরভাবে চিন্তা করে' *(রূম ২১)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'হে মানব জাতি! আরবের উপর অনারবের, অনারবের উপর আরবের, লালের উপর কালোর কিংবা কালোর উপর লালের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, কেবল তাক্বওয়া ব্যতীত'।[৬]

উল্লিখিত আয়াত ও হাদীছ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সৃষ্টিগতভাবে নারী-পুরুষ উভয়েই সমান। কিন্তু সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করলে উভয়ের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে রহস্যের ব্যাপক সমাহার। একই উৎস, উপাদান ও আবহাওয়ায় বেড়ে ওঠা নারী-পুরুষের মাঝে সীমাহীন বৈপরীত্য বিদ্যমান।

নারী-পুরুষের সৃষ্টির মাহাত্ম্য ও তাৎপর্য নিরূপণে পবিত্র কুরআনের ভাষ্য, 'পুরুষগণ নারীদের পরিচালক- এ জন্য যে, আল্লাহ তাদের মধ্যে একজনকে (পুরুষকে) অপরের (নারীর) উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। ইহা এ জন্য যে, তারা (যেন) তাদের অর্থ ব্যয় করে। সুতরাং নেককার স্ত্রীলোকগণ (পুরুষের) অনুগতা এবং আল্লাহ যা হেফাযতযোগ্য করে দিয়েছেন লোকচক্ষুর অন্তরালেও তার হেফাযত করে' *(নিসা ৩৪)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 'নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে যেমন পুরুষের আছে তাদের উপর। আর নারীদের উপর রয়েছে পুরুষদের মর্যাদা' *(বাক্বারাহ ২২৮)*।

নারী-পুরুষের শরীরতত্ত্বঃ

নারী ও পুরুষের দৈহিক গঠন ও স্বভাবে রয়েছে বিস্তর পার্থক্য। একই রক্ত, মাংস ও উপাদানে বেড়ে ওঠা সত্ত্বেও তাদের পারস্পরিক বৈপরীত্য অসংখ্য।

স্বাভাবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে তাদের যে বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদের নযরে আসে সেগুলি হ'ল- পুরুষ বলবান, চঞ্চল, দুঃসাহসী, নির্ভীক, চিন্তাশীল, বিপ্লবী, আলোড়ন সৃষ্টিকারী, সহিষ্ণু, মহানুভব, বাস্তববাদী, বেপরোয়া, নিরাপত্তা নিশ্চিতকারী ইত্যাদি। আবার নারী- শান্ত, নমনীয়া, মায়াবিণী, বিদ্বেষিণী, বিলাসী, সংকীর্ণমনা, সংসারী, আবেগী, কলহিণী, ভীরু, প্রেম-স্নেহ-মমতায় অতুলনীয়া ইত্যাদি।

উল্লিখিত সাধারণ পার্থক্য সমূহ ছাড়াও নারী-পুরুষের দৈহিক গঠন ও স্বভাবে নানা প্রকার তারতম্য বিদ্যমান। কারণ, নারী ও পুরুষের শারীরিক উপাদান ও গঠনাকৃতির ব্যাপারে সামঞ্জস্য থাকলেও দৈহিক পার্থক্য এদের কম নয়। সৃষ্টির এটা একটা অপরূপ বৈচিত্র, শরীর বিজ্ঞানীরা নারী-পুরুষের দেহ নিয়ে বিশ্লেষণ করে যে সমস্ত পার্থক্য দেখতে পেয়েছেন, তা নিম্নে উপস্থাপন করা হ'লঃ

(১) মেয়েদের শরীর অম্লধর্মী আর পুরুষদের শরীর ক্ষারধর্মী।

(২) মেয়েদের শরীর চুম্বকধর্মী আর পুরুষদের শরীর বিদ্যুৎধর্মী।

* ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

৫. মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩৪।

৬. মুসনাদে আহমাদ ৫/৪১১ পৃঃ।

(৩) মেয়েদের শরীর স্থিতিশীল ও রক্ষণশীল, পুরুষদের শরীর গতিশীল ও সৃজনশীল।

(৪) সাধারণত পুরুষের দৈহিক ওজন ১৪০ পাউণ্ড আর নারীর ১২৮ পাউণ্ড।

(৫) পুরুষের দেহের মাংসপেশী শতকরা ৪১.৫ ভাগ আর নারীদেহের মাংসপেশী শতকরা ৩৫ ভাগ।

(৬) পুরুষ দেহের হাড়ের ওযন সাধারণত ৭ সের আর নারীর সোয়া ৫ সের।

(৭) পুরুষদেহে শতকরা ১৮ ভাগ চর্বি, নারীদেহে শতকরা ২৮ ভাগ চর্বি, জলীয় অংশও নারীদেহে পুরুষের চেয়ে বেশি।

(৮) রক্তের লাল কণিকা মেয়েদের তুলনায় পুরুষদের অনেক বেশি। পুরুষের এক কিউবার মিলিমিটার রক্তে ৫০ লক্ষ রক্ত কণিকা থাকে। আর মেয়েদের থাকে ৪৫ লক্ষ।

(৯) পুরুষদের মগজের ওযন গড়পড়তা সাড়ে ৪৯ আউন্স এবং নারীদের মগজের ওযন ৪৪ আউন্স। (প্রতি আউন্স আড়াই তোলার সমান)। পুরুষের মগজ তার শারীরিক ওযনের তুলনায় ৪০ ভাগের একভাগ আর নারীর ৪৪ ভাগের একভাগ।

(১০) নারীর পঞ্চেন্দ্রীয় পুরুষের পঞ্চেন্দ্রীয়ের তুলনায় অত্যন্ত দুর্বল। পুরুষের ঘ্রাণশক্তি নারীর চেয়ে অনেক প্রবল। পুরুষ যে পরিমাণ ঘ্রাণ অনুভব করতে সক্ষম, নারী তার অর্ধেকটুকু সক্ষম। পঞ্চেন্দ্রীয়ের এই দুর্বলতা হেতুই নারীর আস্বাদন ক্ষমতা কম। ভাল-মন্দের বিচার করা, স্বর পরীক্ষা করা নারীরা সাধারণতঃ পারে না। পুরুষ এ বিষয়ে তাদের স্বয়ংসম্পূর্ণ পারদর্শিতা প্রমাণ করে।

(১১) নারীর মগজের বক্রতা ও প্যাঁচ পুরুষের চেয়ে অনেক কম। মগজের স্নায়ুমণিতেও বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান।

(১২) মেয়েদের হৃদপিণ্ড পুরুষের হৃদপিণ্ড থেকে ওযনে ৬০ গ্রাম কম।

(১৩) নাড়ীর স্পন্দন পুরুষের চেয়ে নারীর পাঁচটি বেশি।

(১৪) শ্বাস-প্রশ্বাসে পুরুষ ঘন্টায় ১১ গ্রাম কার্বণ জ্বালাতে পারে আর নারী পারে মাত্র ৬ গ্রাম। এখান থেকে প্রমাণিত হয়, নারীদেহে অক্সিজেনের ভাগ কম।

(১৫) পুরুষের শরীর সম্মুখ দিকে ভারি আর নারীর শরীর পিছন দিকে ভারি। এ জন্য নারীর মৃতদেহ পানিতে ভাসে চিৎ হয়ে আর পুরুষের মৃতদেহ ভাসে উপুড় হয়ে। একই কারণে নারীরা হাইহিল জুতা পরে স্বাচ্ছন্দ্যে হাঁটতে পারে।[৭]

উল্লিখিত পার্থক্য ছাড়াও নারী-পুরুষের দৈহিক গঠন ও রহস্যে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য যেমন বিদ্যমান, তেমনি পরিপূর্ণ অসামঞ্জস্যও বর্তমান। সামঞ্জস্যের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, এরা এক দেহ, এক প্রাণ ও একই উপাদানে গড়া। আবার অসামঞ্জস্যের দিক থেকে চিন্তা করলে মনে হয় এরা স্বতন্ত্র ভিন্ন দেহের সৃষ্টি।

নারী-পুরুষের মধ্যে এ পার্থক্য ও ভিন্নতা শরী'আতের দৃষ্টিতে মানসিক ও বাস্তব কর্ম উভয় দিকেই বর্তমান পাওয়া যায়। নারীদের সম্পর্কে নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'এরা হচ্ছে দৈহিক ও মানসিক অর্থাৎ, বুদ্ধি ও কর্ম যোগ্যতার দিক দিয়ে অপূর্ণ ও অপরিপক্ক'। এখানে 'মানসিক ও বুদ্ধি'র দ্বারা তাদের জ্ঞান বুদ্ধি ও ধী-শক্তির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর 'দৈহিক বা কর্ম যোগ্যতার দ্বারা শারীরিক শক্তি-সামর্থ্য ও ক্ষমতার কথাই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তারা এ দু'টি দিক হ'তেই পুরুষের তুলনায় দুর্বল, অপূর্ণ ও অপরিপক্ক'।[৮]

নারী-পুরুষ যমজ তত্ত্বঃ

মানব জীবনের এক বিস্ময়কর উপাখ্যান হ'ল যমজ নারী-পুরুষ। মানবজীবনের এটি একটি রহস্যময় অধ্যায়ও বটে। একই অবয়বে সুস্থ-সুন্দর, ফুটফুটে কোন যমজ শিশুর জন্ম হ'লে পিতা-মাতা থেকে শুরু করে পুরো পরিবারেই নেমে এক অপার আনন্দের জোয়ার। পক্ষান্তরে একাধিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ অদ্ভুত বিকৃত যমজ শিশুর জন্ম হ'লে তার পিতা-মাতাসহ পুরো পরিবারটি নিমজ্জিত হয় এক অস্ফুট যন্ত্রণার হাহাকারে। কিন্তু কোন পিতা-মাতাই তাদের এমন অনাকাঙ্ক্ষিত সন্তানকেও দূরে ঠেলে দেয় না। চিরন্তন মমতা ও ভালবাসায় তাকেও লালন পালন করে সমানভাবে। আর এভাবে শিশুটির বড় হয়ে ওঠার মধ্যে যুগপৎভাবে তার পিতা-মাতার হৃদয়ের হাহাকারটিও বড় হয়ে ওঠে।

যমজের ধরনঃ

স্বাভাবিক যমজদের মধ্যে দু'টি প্রকারভেদ রয়েছে। একডিম্বজ এবং দ্বিডিম্বজ যমজ। একডিম্বজ যমজরা সাধারণতঃ একই চেহারার, একই আচরণের এবং একই প্রবণতার হয়ে থাকে। আর দ্বিডিম্বজ যমজরা স্বতন্ত্র চেহারারও হ'তে পারে এবং আচরণ ও প্রবণতায়ও ভিন্নতা থাকতে পারে। এই স্বাভাবিক যমজ লালন-পালনেও মাতা-পিতাকে হিমশিম খেতে হয়। সেখানে কনজয়েন্ড (মাথার দিক থেকে সংযুক্ত) এবং সিয়ামিজ (ঘাড়ের নিচ থেকে যেকোন স্থানে সংযুক্ত) যমজ নিয়ে মাতা-পিতার সমস্যা ও সংকট অবর্ণনীয়।

যমজ কিভাবে হয়ঃ

মানুষের মনে এক কৌতূহল হ'ল, যমজ জন্ম হয় কিভাবে? যখন একটি নিষিক্ত ডিম্বানু দ্বিভাজিত হয়, তখন অভিন্ন রূপ যমজ বা আইডেন্টিকাল টুইনসের জন্ম হয়। আর দু'টি আলাদা ডিম্বানু নিষিক্ত হ'লে ভিন্নরূপ যমজের বা ফ্র্যাটারনাল টুইনসের জন্ম হয়। বর্তমানে ইংল্যান্ডে ৯০টি

৭. মুহাম্মাদ নুরল ইসলাম, বৈজ্ঞানিক মুহাম্মাদ (দ.), (ঢাকাঃ জুন ২০০০ ইং), ২/১৪-১৫ পৃঃ; হাফেজ আজিজুল ইসলাম, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে নারী, পৃঃ ৪৯।

৮. ফাৎহুল ক্বাদীর, ৫/৪৮৬ পৃঃ।

শিশুর জন্মের মধ্যে একটি যমজ শিশুর জন্ম হয়। ৪০ এবং ৫০ এর দশকে সংখ্যাটি ছিল ৮০ তে একটি। যমজ জন্ম মূলতঃ জাতিগত মায়ের বয়স, খাবার এবং দম্পতির মিলনের হারের উপর নির্ভরশীল।[৯]

নারী-পুরুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যঃ

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সর্বাপেক্ষা সুন্দর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। দান করেছেন বিবেক, মেধা ও ইচ্ছাশক্তি, যা অন্য কোন প্রাণীকে দেননি। এই যে সুন্দর অবয়বে সৃষ্টি ও অন্যান্য বিষয়গুলি তিনি দিয়েছেন, তাতে কোন না কোন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য আছে। মানুষকে তিনি এমনিতে সৃষ্টি করেননি; বরং সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্যই তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আর সেই দায়িত্বগুলি যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই উভয়কালীন জীবনের সুখ-শান্তি, দুঃখ-দুর্ভোগ নির্ভর করে।

আল্লাহ বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ- مَا أُرِيْدُ مِنْهُمْ مِنْ رِّزْقٍ وَّمَا أُرِيْدُ أَنْ يُّطْعِمُوْنِ-

'আমি সৃষ্টি করেছি জিন ও মানুষকে কেবল আমার ইবাদত করার জন্য। আমি তাদের কাছে রিযিক চাই না এবং এটাও কামনা করি না যে, তারা আমাকে খাওয়াবে' *(যারিয়াত ৫৬-৫৭)*।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 'আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই কোন না কোন রাসূল প্রেরণ করেছি এই নির্দেশ প্রচারের জন্য যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তাগূত থেকে দূরে থাক' *(নাহল ৩৬)*।

এছাড়া আরও অনেক আয়াত রয়েছে, যাতে ইবাদত করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তা প্রত্যক্ষভাবে কিংবা পরোক্ষভাবে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে তাদের কৃতকর্মের আপ্যায়নস্বরূপ অনন্তকাল বসবাসের জান্নাত' *(সাজদাহ ১৯)*। এই আয়াতের মর্মার্থ সহজে অনুমেয়।

এখানে আমরা একটি বিষয়ে আলোকপাত করতে পারি যে, ইবাদত করার নিমিত্তেই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষ স্বীয় জীবদ্দশায় সৎকর্ম করার পর মারা গেলে পরকালে সেই কর্মের প্রতিফল পাবে। মানুষের জীবন দু'ভাগে বিভক্ত। আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক। অধ্যাত্মিক বলতে ব্যক্তি জীবনে কুরআন-সুন্নাহ্র সঠিক পদ্ধতি অনুযায়ী ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত প্রভৃতি আদায় করা বুঝায়। অনুরূপ বৈষয়িক জীবন বলতে চাকরি করা, ডাক্তারী করা ব্যবসা-বাণিজ্য, সমাজনীতি, রাজনীতি ইত্যাদিকে বুঝায়। এসবই আল্লাহ প্রেরিত বিধান অনুযায়ী পালন করাকেও ইবাদত বলা হয়। এগুলি হাক্কুল্লাহ বা আল্লাহ্র অধিকার।

অপরদিকে বান্দার হক তথা, উত্তম ব্যবহার, মাতা-পিতা, নিকটআত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করা ইত্যাদিও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। কেবল ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত আদায়ের জন্য মানুষ সৃষ্টি করা হয়নি; বরং এগুলির পাশাপাশি আরও কতিপয় দায়িত্ব পালনের জন্য মানুষ সৃজিত হয়েছে।

আল্লাহ বলেন, 'তোমার রব আদেশ করছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত কর না এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। যদি তাঁদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উহ' পর্যন্ত বল না এবং তাঁদেরকে ধমক দিয়ো না; তাদের সাথে বিনম্রভাবে সম্মানসূচক কথা বল, তাদের সামনে শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সাথে অবনত থেক আর প্রার্থনা কর- হে আমার রব! তাঁদের উভয়ের প্রতি দয়া করুন, যেভাবে তাঁরা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছেন' *(বনী ইসরাঈল ২৩-২৪)*।

অপর একটি আয়াতে সদ্ব্যবহারের বিষয়টি আরও বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। যাতে পিতা-মাতাই কেবল নয় অন্যান্যরাও এতে অন্তর্ভুক্ত। যেমন আল্লাহ বলেন, 'সদ্ব্যবহার কর পিতা-মাতার সাথে, আত্মীয়-স্বজনের সাথে, ইয়াতীমদের সাথে, মিসকীনদের সাথে, নিকট প্রতিবেশী ও দূর-প্রতিবেশীর সাথে, সঙ্গী-সাথী ও পথচারীর সাথে এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের সাথে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পসন্দ করেন না দাম্ভিক আত্ম-গর্বিত ব্যক্তিকে' *(নিসা ৩৬)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা একে অপরের দোষ অন্বেষণ কর না, পরস্পর গুপ্তচরবৃত্তি কর না, পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ কর না, হিংসা কর না, পরস্পর ঘৃণা কর না, পরস্পরে চক্রান্ত কর না। তোমরা সকলে আল্লাহ্র বান্দা হিসাবে ভাই ভাই হয়ে যাও'।[১০]

শেষকথাঃ

আলোচনার সমাপ্তিতে আমরা বলতে পারি, নারী-পুরুষ মহান আল্লাহ্র বিস্ময়কর ও বৈপ্লবিক সৃষ্টি। সৃষ্টি-মাহাত্ম্য ও বৈশিষ্ট্যে পার্থক্য থাকলেও একই উদ্দেশ্যে তারা সৃজিত। সুখময় সুন্দর জীবন ও পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র গড়ার ক্ষেত্রে পরস্পরকে দান করেছেন স্বতন্ত্র স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও মনোহর বৈশিষ্ট্য। বিশ্ব সংসারে কেবল মানুষকেই সকল সুখের প্রদীপ জ্বালানোর অবকাশ দিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা। তাঁর সৃষ্টির মাঝে রয়েছে রহস্যময় ও তাৎপর্যমণ্ডিত লীলা! এসবই সেই মহা মহিমের একক সার্বভৌমত্বের বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহ আমাদের সকলকে তার সৃষ্টি রহস্য সম্বন্ধে সঠিক চিন্তা-গবেষণার এবং তাঁর ইবাদতে আত্মনিয়োগ করার সুযোগ দান করুন। অবারিত কল্যাণ বর্ষিত হৌক আমাদের সকলের উপর। আমীন!

---

৯. বিস্তারিত দেখুনঃ আতিক হেলাল, ফিচারঃ যমজ উপখ্যান, দৈনিক ইনকিলাব (শুক্রবারের ইনকিলাব বিনোদন) ৯ আগষ্ট ২০০২, পৃঃ ৯।

১০. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫০২৮।

দায়িত্ব

রফীক আহমাদ*

পৃথিবীতে মানুষের আগমন একাকী এবং বিদায়ের পালাও একাকী। আগমনের পূর্বস্থল কোথায়, কিরূপ এবং কতদিনের তার সঠিক উত্তর কেউ দিতে পারে না। তবে ঐ সময়ের একজন মহাজ্ঞানবান ও মহাক্ষমতাবান অভিভাবক থাকেন, তিনি স্বয়ং স্রষ্টা আল্লাহ। জন্মের পূর্বাবস্থার ইত্যাকার বর্ণনা তিনি ছাড়া আর কেউ অবগত নন। যখন পৃথিবী হ'তে বিদায়ের পালা আসে, তখনও যেতে হয় সঙ্গীহীন অবস্থায় একাকী। এই একাকী অবস্থার অবস্থানস্থল কবর-এর পরবর্তী সংবাদ নিঃসন্দেহে পৃথিবীতে আগমনের পূর্বস্থলের মতই অজ্ঞাত এবং সবার জন্য নিরাপদ নয়। তবে সাদৃশ্যপূর্ণ ও সঠিক সংবাদনামা হ'ল আগমন ও বিদায় উভয় সন্ধিক্ষণেই সবাই থাকে একান্ত অসহায়, যার হুবহু বর্ণনা দেওয়া মোটেও সম্ভব নয়। অবশ্য অসহায়ত্বের এই অতুলনীয় বন্দোবস্তের অব্যর্থ আইন সম্পর্কে পরিণত বয়সে সকলেই জানতে পারে অনায়াসে।

মানবজাতির জন্ম বৃত্তান্তের প্রাথমিক বিপর্যয়ের পরই আসে স্বাভাবিকভাবে বয়োবৃদ্ধি ও জ্ঞানবৃদ্ধির সম্মিলিত উন্মেষ এবং এখান থেকেই শুরু হয় নিজ দায়িত্ব গ্রহণের পালা। ফলে কৈশোরেই দেখা যায় অতুলনীয় বৈপরীত্যের সমাহার। কারণ শিক্ষা লাভের মূল উৎসের সন্ধানে মানব শত্রু শয়তানের ভূমিকা অনস্বীকার্য। যেহেতু শয়তানের আবির্ভাব হয়েছে মানব জাতির প্রতিযোগী ও প্রতিপক্ষ হিসাবে, আল্লাহ্‌র অনুমোদনক্রমে। ইহাও মানবজাতির সর্বজনস্বীকৃত সংবাদনামা। এই অবস্থার পেক্ষাপটেই পূর্ণতা লাভ করে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ। অতঃপর সে দেখতে পায় নিজ জাতি-ধর্মের অসংখ্য সঠিক ও ভ্রান্ত পথের দিগন্ত।

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের বিপুল সৃষ্টিরাজির ন্যায় মানব হৃদয়েরও রয়েছে অনুরূপ বিশাল পরিসর, যা তাকে উন্নতির শিখরেও নিয়ে যেতে সক্ষম হয় এবং অধঃপতনের অতল তলেও নিয়ে যেতে পারে। এমতাবস্থায় প্রয়োজন সুস্থ মানসিকতা, অকৃত্রিম চিন্তা ও মুক্ত মনের অধিকারী হওয়া, যা পেয়েছি আমাদের বিশ্বনবীর অতুলনীয় আদর্শ থেকে। তিনি ছিলেন ইয়াতীম, দরিদ্র, নিরক্ষর, উদার, ভাবুক, চিন্তাশীল ও অনুসন্ধায়ক। তাঁর প্রতি বিশ্বশ্রেষ্ঠ মহাপবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং দেখা যায় নিজ দায়িত্ব পালনে মহানবীর মহান ও অকৃত্রিম ভূমিকাই মানব জাতির প্রতি কর্তব্য হিসাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্পিত হয়েছে।

বাস্তব জীবনের যে কোন অজুহাতকে খণ্ডন করার জন্য মহানবী (ছাঃ)-এর আদর্শ ব্যতীত আরও অসংখ্য উদাহরণ ইতিহাসের পাতায় বিদ্যমান। উপযুক্ত পিতা-মাতা, অভিভাবক ও সহায়ক বর্তমান থাকতেও বহু মানব সন্তান পথভ্রষ্ট হয়ে ছিটকে পড়ে। পক্ষান্তরে পিতৃমাতৃহীন সহায় সম্বলহীন, ধর্মদ্রোহীর ঘরেও অনেক দায়িত্ববান সন্তান ও নর-নারী শিক্ষা ও জ্ঞানের মাধ্যমে সৎপথ প্রাপ্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ হযরত নূহ (আঃ)-এর স্ত্রী ও পুত্র এবং হযরত লূত্ব (আঃ)-এর স্ত্রীর পথভ্রষ্ঠতা আবহমানকালের ধর্মদ্রোহীর উজ্জল স্বাক্ষর। অপরদিকে বিশ্বশ্রেষ্ঠ ধর্মদ্রোহী ও উৎপীড়ক ফের'আউনের স্ত্রীও নিজ জ্ঞান ও দায়িত্বে আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করে। ইহাও সৎ পথ প্রাপ্তদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার আবহমানকালের অমোঘ বাণী। এভাবে যুগে যুগে বহু সর্বজন পরিচিত ও অপরিচিত ব্যক্তিত্ব পৃথিবীর বুকে ভাল ও মন্দের বিপরীতমুখী বোঝা নিয়ে গর্বের সাথে কালাতিপাত করে আসছে চিরাচরিত নিয়মে। কোন যুগে বা শতাব্দীতে এর বাস্তব উদাহরণের অভাব নেই।

সম্প্রতি আধুনিক উন্নত বিশ্বেও ঘটে গেল তৎকালীন ফের'আউন, নমরূদ, হালাকু খাঁর মত বর্বরোচিত ঘটনার পুনরাবৃত্তি। গত ২০ শে মার্চ ২০০৩ তারিখে বিশ্বের অন্যতম পরাশক্তি আমেরিকা ও বৃটেন বিশ্ব জনমতকে উপেক্ষা করে নিজ দায়িত্বে ইরাকে হামলা চালিয়ে দেশটির হাযার হাযার নিরীহ জনগণকে নির্বিচারে হত্যা করল। শেষপর্যন্ত সেখানকার সরকারকে উৎখাত করে দেশটির দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে। এখানো সেখানে প্রতিনিয়ত রক্ত ঝরছে। নিরপরাধ ইরাকীদের উপর দখলদার বাহিনী নির্মম নির্যাতন চালাচ্ছে। সাদ্দাম পুত্র উশেও ও কুদেকে হত্যা করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসাইনকে গ্রেফতার করে তাঁর উপরও অমানবিক নির্যাতন চালানো হচ্ছে। একের পর এক গ্রাম তছনছ করে দিচ্ছে হানাদার বাহিনী। অসহায় ইরাকীদের আর্তচিৎকারে আকাশ-বাতাস আজ ভারী হয়ে ওঠেছে। এসবই ঘটছে বিশ্ব জনমতের সম্পূর্ণ বিপরীতে। এরূপ ছোটবড় অনেক ইতিহাস অহরহ ঘটেই চলেছে বর্তমান বিশ্বে।

মৃত্যুর পরে ভাল কাজের বিনিময়ে পুরষ্কার এবং মন্দ কাজের বিনিময়ে শাস্তির অব্যর্থ ব্যবস্থা আছে, মহাজ্ঞানী আল্লাহ্‌র এই বাণীর প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাসীরাই হ'ল ঈমানদার। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র ঐ বাণীর প্রতি অবিশ্বাসীরাই হ'ল বেঈমান বা অবিশ্বাসী। বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী ও অনুসন্ধিৎসু সকল শ্রেণীর মানুষই নিজ নিজ জ্ঞান-বুদ্ধি, শিক্ষা-দীক্ষা, বিবেক-বিবেচনা, চিন্তা-ভাবনা ইত্যাদির দ্বারা পরিপূর্ণ। কাজেই কর্মজীবনের লক্ষ্য নির্ধারণে নিজ পরিকল্পনা ও অভিপ্রায় সরাসরি কাজ করে। মহামহিমাময় আল্লাহ তা'আলা তাঁর একান্ত প্রিয় ও শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি 'মানবজাতির সকল কর্ম, ইচ্ছা, অভিপ্রায়, অনুকূল, প্রতিকূল ইত্যাদি অবস্থার সার্বক্ষণিক পরিস্থিতির হুবহু অবয়ব মহাপবিত্র কুরআনে উপস্থাপন করেছেন। আমরা সেগুলি সম্ভাব্য পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আলোচ্য শিরোনামের পরিধিভূক্ত করতে চাই। সমগ্র মানব জাতিকে লক্ষ্য করে

* প্রফেসর পাড়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِ يَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ-

'যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎ-কর্মপরায়ণদের সাথে আছেন' *(আনকাবূত ৬৯)*।

নিঃসন্দেহে এই আয়াতের একটা আধ্যাত্মিক অর্থ রয়েছে, যার বিশদ ব্যাখ্যা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। একটা সাদৃশ্যপূর্ণ আলোচনাকে হৃদয়গ্রাহী ও পূর্ণতা প্রদানের জন্য মহান আল্লাহ বলেন,

اَلَّذِيْنَ آمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ اَلَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ طُوْبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ-

'যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহ্র যিকর দ্বারা শান্তি লাভ করে, জেনে রেখো, আল্লাহ্র যিকর দ্বারাই অন্তর সমূহ শান্তি পায়। যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎ কর্ম সম্পাদন করে, তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ এবং মনোরম প্রত্যাবর্তনস্থল *(রা'দ ২৮-২৯)*।

আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের আলোকে ও পবিত্র কুরআনের এই বক্তব্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে যে কেউ সংগত কারণেই গভীরভাবে আস্থাশীল হ'তে পারেন। আল্লাহ্র ক্ষমতা সবকিছুর উপর বিদ্যমান এবং তাঁর অসীম জ্ঞানভাণ্ডার সব জিনিসকে পরিব্যপ্ত করে রেখেছে। সুতরাং যারা সর্বশক্তিমান ও মহান স্রষ্টার অস্তিত্ব ও শাশ্বতবাণীর প্রতি পুরোপুরিভাবে অভিভূত তারা অতীব সৌভাগ্যবান। স্বয়ং আল্লাহ পাক তাদের অভিভাবক ও পরিচালক হয়ে যান। তিনি বলেন,

هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ-

'এটা ভাববার বিষয় যে, তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে এবং হেদায়াত ও রহমত সেসব লোকের জন্য যারা ঈমান এনেছে' *(আ'রাফ ২০৩)*।

একই ভাবধারায় অন্যত্র অবতীর্ণ হয়েছে,

مَنْ يَّهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِىْ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَأُولئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ-

'যাকে আল্লাহ পথ দেখাবেন সেই পথপ্রাপ্ত হবে। আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করবেন, সেই হবে ক্ষতিগ্রস্ত' *(আ'রাফ ১৭৮)*।

আগেই বলেছি, মানুষ সৃষ্টির সেরা জ্ঞানী, চিন্তাবিদ ও যার কোন তুলনা নেই। তাই মহাপরাক্রম ও মহাজ্ঞানবান আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তার জ্ঞানের সদ্ব্যবহার দ্বারা আল্লাহ্র আদেশ ও নিষেধ সুপ্রতিষ্ঠিত করার নির্দেশ দিয়েছেন। যারা সতর্কতার সাথে অসীম কুদরতের প্রতি আত্মসমর্পন করে, আল্লাহ তার প্রতি দয়া, করুণা, রহমত ও ভালবাসার দ্বার উন্মুক্ত করে দেন। ফলে সে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের সন্ধান পেয়ে যায় এবং স্বয়ং আল্লাহই তার সৎ বুদ্ধি দাতা। তাঁর শাশ্বত বাণী থেকেই ঈমানের উৎপত্তি হয় এবং মুক্ত মনের অধিকারী যেকোন ব্যক্তিকে তা প্রভাবিত করে এবং মন্ত্র শক্তির ন্যায় কাজ করে। এক্ষেত্রে নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও নিজ স্রষ্টার অন্বেষণকারী এবং ধর্মীয় তত্ত্ব নিয়ে চিন্তাবিদদের কথা অন্যতম।

মনে রাখা দরকার যে, পবিত্র কুরআনের বাণী সমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকারীরা নিজেরাই অবিশ্বাস্যভাবে উপকৃত হয়। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ্র বাণী হ'ল-

فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا،

'যে সৎ পথে আসে, সে নিজের কল্যাণের জন্যেই আসে, আর যে পথভ্রষ্ট হয়, সে নিজেরই অনিষ্টের জন্য পথভ্রষ্ট হয়' *(যুমার ৪১)*।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا،

'যে সৎ কর্ম করে; সে নিজের উপকারের জন্যেই করে, আর যে অসৎ কর্ম করে, তা তার উপরই বর্তাবে' *(হা-মীম-সাজদাহ ৪৬)*।

মহান আল্লাহ আরও বলেন, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ-

'যে সৎ কাজ করছে, সে নিজের কল্যাণার্থেই করছে, আর যে অসৎ কাজ করছে, তা তার উপরই বর্তাবে? অতঃপর তোমরা তোমাদের পালন কর্তার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে' *(জাছিয়া ১৫)*।

আল্লাহ্র প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও পার্থিব জীবনের সৎকর্ম হ'ল আখেরাত তথা ক্বিয়ামত দিবসের একমাত্র রক্ষাকবচ। তাই শেষ বিচার দিবসের মালিক মহান আল্লাহ বলেন,

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَّوْمَئِذٍ آمِنُوْنَ- وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ-

'যে কেউ সৎ কর্ম নিয়ে আসবে, সে উৎকৃষ্টতর প্রতিদান পাবে এবং সেদিন তারা গুরুতর অস্থিরতা থেকে নিরাপদ থাকবে এবং যে মন্দ কাজ নিয়ে আসবে, তাকে অগ্নিতে অধঃমুখে নিক্ষেপ করা হবে' *(নমল ৮৯, ৯০)*।

যেকোন সৎ কর্মের জন্য উত্তম প্রতিদান এবং অসৎ কর্মের জন্য বিপরীত প্রতিফলের সূত্র ধরেই সকলের অবগতি ও হুঁশিয়ারীর তাৎপর্যময় বক্তব্যে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهُ نَصِيْبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا-

'যে লোক সৎ কাজের জন্য কোন সুপারিশ করবে, তা থেকে সেও একটি অংশ পাবে। আর যে লোক সুপারিশ করবে মন্দ কাজের জন্য সে তার বোঝারও একটি অংশ পাবে। বস্তুতঃ আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল' *(নিসা ৮৫)*।

মানুষ শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ ও সুবিজ্ঞ জ্ঞানের অধিকারী, তাই নিজ জীবনের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য পরিগ্রহণের মাধ্যমেই সূচিত হয় সত্য-মিথ্যা, সৎ-অসৎ, সঠিক-বেঠিক, ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, নিয়ম-অনিয়ম ইত্যাদির মত মৌলিক নিত্য ঘটিত বিশ্বাসযোগ্য ও অবিশ্বাসযোগ্য ঘটনাবহুল জীবন প্রবাহ। এমতাবস্থায় যারা আসমান-যমীন, সূর্য-চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্র, শূন্য-মহাশূন্য, পাহাড়-পর্বত, সাগর-মহাসাগর, মরুভূমি-মরুদ্যান, বন-জঙ্গল, সমতলভূমি, মালভূমি, অগণিত হিংস্র ও নিরীহ প্রাণী, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদির সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তার চিন্তা করে, তারাই ভীত-বিহ্বল হয়ে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির পথ অনুসন্ধান ও অনুসরণ করে। অতঃপর তারা আল্লাহ্র নির্দেশিত সৎ কর্ম সম্পাদনে আত্মনিয়োগ করে এবং বিনীতভাবে আল্লাহ্র সাহায্যের প্রত্যাশা করে। আল্লাহ এদের কার্যকলাপ, দো'আ ও মনস্কামনা পূর্ণ করেন। পক্ষান্তরে যারা এদের আদর্শের পরিপন্থী কাজে লিপ্ত হয়ে পৃথিবীর মোহে পার্থিব জীবনকেই প্রাধান্য দেয়, আল্লাহ তাদের প্রতি বিমুখ হয়ে পড়েন এবং তাদের শাস্তির ঘোষণা দেন।

উপরে বর্ণিত আয়াতগুলির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আলোচ্য আদর্শ-অনাদর্শ ও অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতির উজ্জল স্বাক্ষর বহন করে। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, সৎ কর্ম সম্পাদনশীলরা নিজেদের কল্যাণেই ভাল কাজ করে, যার প্রতিদান ইহকালে পায় এবং পরকালেও পাবে, তা কখনই বিফলে যাবে না। পক্ষান্তরে আল্লাহ্র আদেশ অমান্যকারী বিপরীতপন্থীরা পার্থিব জীবনে সাময়িক আনন্দভোগের পর ইহজগতেই লাঞ্ছিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে এবং ধারাবাহিক শাস্তির মধ্য দিয়ে ক্বিয়ামতের মহাপ্রলয়ে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হবে।

ভবিষ্যৎ জীবনের লক্ষ্য-নির্ধারণে যারা মারাত্মকভাবে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, এর প্রধান কারণ হিসাবে তাদের ধন-সম্পদ, জাকজমকপূর্ণ অট্টালিকা, সন্তান-সন্ততি, আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদি শীর্ষস্থানীয়। মহান আল্লাহ বলেন,

وَاعْلَمُوْا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَّأَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيْمٌ-

'জেনে রাখ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ফিৎনা বা পরীক্ষা স্বরূপ। বস্তুতঃ আল্লাহ্র নিকটে রয়েছে মহাসওয়াব' *(আনফাল ২৮)*।

ধন-দৌলত, স্ত্রী, পুত্র, কন্যার প্রতি মানুষের স্নেহ ভালবাসা ও দুর্বলতা সর্বজনবিদিত। কিন্তু ব্যাপক নিরীক্ষার যৌক্তিকতায় এদের অধিকাংশ ব্যাপারটাই জটিলতায় পূর্ণ।

মহা সম্মানিত আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় মুমিন বান্দাদের সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَتُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلاَأَوْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَالِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ-

'হে মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্র স্মরণ থেকে গাফেল না করে। যারা এ কারণে গাফেল হয়, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত' *(মুনাফিকূন ৯)*।

আল্লাহ্র ক্ষমতা সবকিছুর উপর বিদ্যমান এবং তাঁর মহাজ্ঞানও সবকিছুকে পরিব্যপ্ত করে রেখেছে। আল্লাহ্র প্রতিনিধি মানুষের ক্ষমতা রয়েছে নিজের উপর এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নিজের গোত্রের উপরও সীমাবদ্ধ থাকে। এদের পূর্ণ স্বাধীনভাবে চলার ক্ষমতা ও জ্ঞান রয়েছে বা মহান স্রষ্টা তা দান করেছেন। এমতাবস্থায় প্রতিটি মানুষ তার মানবীয় সিদ্ধান্তের জন্য নিজেই দায়ী। শুধু তার ইচ্ছা অনুযায়ী আশা-আকাংখা পূরণ করেন অর্থাৎ কেউ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সাহায্যে আল্লাহ্র মনোনীত পথে অগ্রসর হ'তে চাইলে, আল্লাহ তাকে পথ দেখান। ফলে সে পথপ্রাপ্ত হয়ে আল্লাহ্র প্রিয়ভাজন হয়ে যায়। অপরদিকে অনেকে পার্থিব জগতের চোখ জুড়ানো ধন-সম্পদের মোহে, সন্তান-সন্ততির প্রেমে আল্লাহ্র অসীম ও অপার ক্ষমতার কথা ভুলে যায়, তখন আল্লাহও তাদেরকে নিজ পথে ছেড়ে দেন, ফলে তারা পথভ্রষ্ট হয়ে আল্লাহ্র প্রতিশ্রুত জাহান্নামের চিরস্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যায়। তাই এ জগতের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কেবল পরীক্ষা স্বরূপ বলেই আল্লাহ ঘোষণা করেছেন। অতঃপর জ্ঞানী ও মুমিন বান্দাদের সাবধান করে উল্লেখিত শেষোক্ত আয়াতে জানিয়ে দিয়েছেন, যাতে তারা নিজেদের ধন-সম্পদ ও প্রাণপ্রিয় সন্তান-সন্ততির আকর্ষণে পড়ে আল্লাহ্র স্মরণ থেকে গাফেল না হয়।

কারণ সর্বজ্ঞানী আল্লাহ মানুষের চলার পথে বা পার্থিব জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণে বাধা দেন না। কাজেই মানুষ নিজেই নিজের জীবনের ভাল-মন্দ লক্ষ্যস্থির করে বা পরিবর্তন ঘটায়। কুরআনে মানবজাতির এই গোপন সংবাদটিও মহাসংবাদ হয়ে সসম্মানে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

إِنَّ اللَّهَ لاَيُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ،

'আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে' *(রা'দ ১১)*। অপর এক আয়াতে আল্লাহ বলেন,

بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ-

'আল্লাহ কখনও পরিবর্তন করেন না সেসব নে'মত, যা তিনি কোন জাতিকে দান করেছিলেন, যতক্ষণ না সে জাতি নিজেই পরিবর্তন করে দেয় নিজের জন্য নির্ধারিত বিষয়। বস্তুতঃ আল্লাহ শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী' *(আনফাল ৫৩)*।

উপরিউক্ত মহাসত্য বাণীর অবলম্বনে নিম্নে আরও কতিপয় আয়াতের উদ্ধৃতি দেয়া হ'ল,

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيَوةَ الدُّنْيَا وَ زِيْنَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لاَيُبْخَسُوْنَ، أُولَئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِى الْآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ-

'যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্যই কামনা করে, আমি তাদের দুনিয়াতেই তাদের আমলের প্রতিফল ভোগ করিয়ে দেব এবং তাতে তাদের প্রতি কিছুমাত্র কমতি করা হয় না। এরাই হ'ল সেসব লোক, আখেরাতে যাদের জন্য আগুন ছাড়া কিছু নেই' *(হূদ ১৫-১৬)*।

অন্যত্র তিনি বলেন,

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيْهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا- وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَمُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا-

'যে কেউ ইহকাল কামনা করে, আমি সেসব লোককে যা ইচ্ছা সত্ত্বর দিয়ে দেই। অতঃপর তাদের জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করি। ওরা তাতে নিন্দিত-বিতাড়িত অবস্থায় প্রবেশ করবে। আর যারা পরকাল কামনা করে এবং মুমিন অবস্থায় তার জন্য যথাযথ চেষ্টা সাধনা করে, এমন লোকদের চেষ্টা স্বীকৃত হয়ে থাকে' *(বণী ইসরাইল ১৮-১৯)*।

একই মর্মার্থে মহাপ্রজ্ঞাময় আল্লাহ আরো বলেন,

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِىْ حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فِىْ الْآخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ-

'যে কেউ পরকালের ফসল কামনা করে, আমি তার জন্য সেই ফসল বাড়িয়ে দেই। আর যে ইহকালের ফসল কামনা করে, আমি তাকে তার কিছু দিয়ে দেই এবং পরকালে তার কোন অংশ থাকবে না' *(শূরা ২০)*।

নভোমণ্ডল-ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী যাবতীয় সৃষ্টির মধ্যে মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। তাই মানুষ বহুবিধ গবেষণা জ্ঞানের দ্বারা বিশ্বমুখী ধ্যান ধারণায় উন্নত ও অত্যাশ্চর্য পরিকল্পনা গ্রহণ করে। একদিকে আধুনিক বিজ্ঞানীরা একদল মহাশূন্যের গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদির অকল্পনীয় তথ্য সংগ্রহ নিয়ে যেমন ব্যস্ত, অন্যদিকে আর একদল বিশাল যমীনে ভূগর্ভের মূল্যবান খনিজ পদার্থ আবিষ্কারে দিবা-রাত্রি দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। শুধু তাই নয় পার্থিব জগতের শক্তি পরীক্ষায় সমগ্র জগতে চলছে মারণাস্ত্র তৈরীর তুমুল প্রতিযোগিতা। যা ভাষায় বর্ণনা যোগ্য নয়। একইভাবে চলছে ধন-সম্পদ, অট্টালিকা, রঙ্গমঞ্চ ইত্যাদি নিয়েও মানবিক ও অমানবিক কলাকৌশলের হীনতম প্রযুক্তি। আবার পারিবারিক ও সামাজিক জীবনেও চলছে ব্যক্তিগত জ্ঞান-বুদ্ধির অদ্ভুত লীলাখেলা। এসবের মাঝেই বিক্ষিপ্তভাবে রয়েছে পাশাপাশি ধর্ম-অধর্মের একান্ত গোপন অভিযান।

এই অভিযানে একদল ইহকালের সদ্যপ্রাপ্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ধন-সম্পদ, অর্থ, আড়ম্বর, সন্তান-সন্ততি, মান-সম্মান, শক্তি-সামর্থ্য, প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদির উন্নতি কামনা করে এবং তাতেই আত্মনিয়োগ করে। পক্ষান্তরে অপর একদল পরকালের মহাবিচারের চিন্তায় ইহকালের সুখ ও ভোগ-বিলাসকে বিসর্জন দিয়ে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির পথে আত্মোৎসর্গ করে। আল্লাহ তাদের সকলের মনের ও বাইরের খবর জানেন এবং তাদের সকলের মনস্কামনাও পূরণ করেন।

উপরিউক্ত আয়াতগুলি মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্র মহাপ্রকল্পের রূপান্তর। তিনি তাঁর প্রতিশ্রুত বাণী দ্বারা ভাল-মন্দ সকল বান্দাকে সমানভাবে সাবধান করে দিয়েছেন। মানুষ তার নিজ কামনা, বাসনা, সাধনা, প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায়ের দ্বারা যা অর্জন করতে চাইবে, নিরপেক্ষ ও অন্তর্যামী আল্লাহ তা'আলা অকাতরে তাকে তাই দান করবেন।

অবশ্য আল্লাহ্র এই স্বর্গীয় মহাসংবাদে ঈমানদারের সংখ্যা অধিকমাত্রায় বেড়ে যায় এবং তারা আল্লাহ্র রহমতের ছায়াতলে আশ্রয় পায়। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ্র ঐ বাণীতে বিশ্বাস স্থাপন করে না; বরং পৃথিবীকে স্থায়ীভাবে ভালবাসে এবং বিভিন্ন পাপে লিপ্ত হয়, তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ বলেন,

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لاَيُؤْمِنُوْنَ-

'সমস্ত জীবের মাঝে আল্লাহ্র নিকট তারাই সবচেয়ে

নিকৃষ্ট, যারা অস্বীকারকারী হয়েছে, অতঃপর আর ঈমান আনেনি' *(আনফাল ৫৫)*।

এদের সম্পর্কে অন্যত্র তিনি বলেন,

وَمَنْ يَّكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا- وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيْئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّ إِثْمًا مُّبِيْنًا-

'যে কেউ পাপ করে, সে নিজের পক্ষেই করে। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। আর যে ব্যক্তি ভুল কিংবা গোনাহ করে, অতঃপর কোন নিরপরাধের উপর অপবাদ আরোপ করে, সে নিজের মাথায় বহন করে জঘন্য মিথ্যা ও প্রকাশ্য গোনাহ' *(নিসা ১১১, ১১২)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

لِلَّذِيْنَ لاَيُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ-

'যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের উদাহরণ নিকৃষ্ট এবং আল্লাহ্র উদাহরণই মহান, তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়' *(নাহল ৬০)*।

অনুরূপ সমালোচনায় অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِى الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيْلاً-

'যে ব্যক্তি ইহকালে অন্ধ ছিল সে পরকালেও অন্ধ এবং অধিকতর পথভ্রান্ত' *(বণী ইসরাইল ৭২)*।

পাপীদের ভীতি সঞ্চারের উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ আরও বলেন,

وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيْمٍ-

'প্রত্যেক মিথ্যাবাদী পাপাচারীর দুর্ভোগ' *(জাছিয়া ৭)*।

পবিত্র কুরআনের এসব বাণী সংরক্ষণের অন্যতম উদ্দেশ্য হ'ল, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী পূণ্যবান-পাপী, ভাল-মন্দ সকল শ্রেণীর লোকদের প্রতি সার্বিক সতর্কতা বজায় রাখা। এতদুদ্দেশ্যে সুবিচারক আল্লাহ পুনরায় বলেন,

إِنَّهُ مَنْ يَّأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لاَيَمُوْتُ فِيْهَا وَلاَيَحْيَى- وَمَنْ يَّأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّلِحَاتِ فَأُولٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى-

'নিশ্চয়ই যে তার পালনকর্তার কাছে অপরাধী হয়ে আসে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম। সেখানে সে মরবে না এবং বাঁচবেও না। আর যারা তাঁর কাছে আসে এমন ঈমানদার হয়ে যারা সৎকর্ম সম্পাদন করেছে, তাদের জন্য রয়েছে সুউচ্চ সম্মান' *(ত্বা-হা ৭৪, ৭৫)*।

বহু জ্ঞাত-অজ্ঞাত, সম্ভব-অসম্ভব, লৌকিক-অলৌকিক, পরিকল্পিত-অপরিকল্পিত, দৃশ্য-অদৃশ্য, বর্ণনীয়-অবর্ণনীয় অসংখ্য উদ্দেশ্য ও সুপরিকল্পনা নিয়ে মানবজাতির প্রতি পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। অবশ্য এ বর্ণনার শীর্ষ প্রতিপাদ্য হ'ল, মানবজাতির প্রতি আল্লাহ্র অসীম করুণা অনুধাবন করানো যারা ধর্মীয় ভাবধারায় আপ্লুত হয়ে পুনরাবির্ভাবের আবর্তে বিশ্বাসী হয়ে পড়ে, তারাই আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যারা সন্দেহযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ধর্মকে সমঝোতার কোন অংশও মনে না করে, তবে সেটা তাদের জন্য শুধু দুঃখজনক নয়, দুর্ভাগ্যজনকও বটে। কারণ মহাপ্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'আলা ধর্মীয় উদ্দেশ্য পূরণে কৃতকার্য ও অকৃতকার্য উভয় শ্রেণীর জন্য পৃথক পৃথক ও সমুন্নত পূর্বাভাষ দিয়েছেন, যা পবিত্র কুরআনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এখানে আল্লাহ তাঁর অস্বীকারকারী, পাপী, পরকালে অবিশ্বাসী, মিথ্যাবাদীদের সবচাইতে ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট বলে বর্ণনা করেছেন।

পৃথিবীর বুকে যে কোন স্বনামধন্য ব্যক্তির আত্মজীবনী অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, তার সকল উন্নতি বা অবনতির জন্য তার ব্যক্তিগত জেদ বা ইচ্ছার প্রতিফলনই মুখ্য ভূমিকায় কাজ করেছে। ক্ষেত্র বিশেষে কেউ কারো প্ররোচনায় জঘন্য অপরাধে লিপ্ত হ'তে পারে, তবে সেক্ষেত্রে তারা উভয়ই অপরাধী ও জাহান্নামী। কারণ কোন চিহ্নিত অপরাধী কখনও কোন নিষ্পাপ বা পূণ্যবান ব্যক্তিকে পথভ্রষ্ট করে পাপে লিপ্ত করতে পারবে না, সে শুধু তার মত পাপীকেই মিথ্যা ও পাপে আবদ্ধ করতে পারবে। এজন্য প্রত্যেক পাপাচারীকে তার পাপের শাস্তি নিজেকেই ভোগ করতে হবে বলে আল্লাহ তা'আলা হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। তিনি বলেন,

وَلاَتَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَتَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ-

'যে ব্যক্তি কোন গোনাহ করে, তা তারই দায়িত্বে থাকে। কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। অতঃপর তোমাদের সবাইকে প্রতিপালকের কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অনন্তর তিনি তোমাদেরকে বলে দিবেন, যেসব বিষয়ে তোমরা বিরোধ করতে' *(আন'আম ১৬৪)*।

একই বিষয়বস্তু নিয়ে অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন,

مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلاَتَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا

مُعَذِّبِيْنَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُوْلاً-

'যে কেউ সৎ পথে চলে, তারা নিজের মঙ্গলের জন্যই সৎ পথে চলে। আর যে পথভ্রষ্ট হয়, সে নিজের অমঙ্গলের জন্যই পথভ্রষ্ট হয়। কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। আর কোন রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত আমি কাউকেই শাস্তি দান করি না' *(বণী ইসরাইল ১৫)*। নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে বান্দাকে ওয়াকিফহাল করার লক্ষ্যে তিনি পুনরায় বলেন,

وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرَى ط وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لاَيُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَّ لَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ط إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَوةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ ط وَإِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ-

'কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। কেউ যদি তার গুরুতর ভার বহন করতে অন্যকে আহ্বান করে কেউ তা বহন করবে না যদি সে নিকটবর্তী আত্মীয়ও হয়। আপনি কেবল তাদেরকে সতর্ক করুন, যারা তাদের পালনকর্তাকে না দেখেও ভয় করে এবং ছালাত কায়েম করে। যে কেউ নিজের সংশোধন করে, সে সংশোধন করে স্বীয় কল্যাণের জন্য। আল্লাহ্র নিকটই সকলের প্রত্যাবর্তন' *(ফাত্বির ১৮)*।

মূলতঃ আমাদের সমাজের ভ্রান্ত ধারণা দূরীকরণার্থে নিজ দায়িত্বের অপরিবর্তণীয় পরিণতির বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া হ'ল। আল্লাহ তা'আলার এই মহাসত্য বাণীর প্রতি গভীরভাবে আস্থাশীল হওয়াই মানুষের জন্য এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী উপদেশমালা। এই সব উপদেশ উল্লিখিত হয়েছে, সেই সব মানুষের জন্য যারা দৈনন্দিন জীবনে সহজ সরল কাজে ও ভাষায় অভ্যস্ত। অপরদিকে আত্মদ্রোহী, আত্মগর্বী, উচ্চাভিলাষী, নাস্তিক, নির্ভীক শ্রেণীর মানুষের জন্য ভ্রম সংশোধনের স্থায়ী সতর্কবাণী। অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا ط اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ- هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ط إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ-

'প্রত্যেক উম্মতকে তাদের আমলনামা দেখতে বলা হবে। তোমরা যা করতে, অদ্য তোমাদেরকে তার প্রতিফল দেওয়া হবে। আমার কাছে রক্ষিত এই আমলনামা তোমাদের সম্পর্কে সত্য কথা বলবে। তোমরা যা করতে আমি তা লিপিবদ্ধ করতাম' *(জাছিয়া ২৮-২৯)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

إِنَّهُمْ كَانُوْا لاَيَرْجُوْنَ حِسَابًا- وَّكَذَّبُوْا بِاٰيَاتِنَا كِذَّابًا- وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا-

'নিশ্চয়ই তারা হিসাব-নিকাশ আশা করত না এবং আমার আয়াত সমূহে পুরোপুরি মিথ্যারোপ করত। আমি সবকিছু লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষিত করেছি' *(নাবা ২৭-২৯)*।

উপরের বিবরণী থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, মানুষের পার্থিব জগতের সঞ্চিত কর্মফল নিজ নিজ দপ্তরে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে যত্ন সহকারে পুস্তকাকারে সংরক্ষিত হচ্ছে। কারণ আল্লাহ তা'আলা এই নশ্বর পৃথিবীকে তাঁর আদেশ পালনের এক পরীক্ষাকেন্দ্র হিসাবে স্থাপন করেছেন, আদেশ লংঘনের জন্য নয়। এখানে যারা আল্লাহ্র আদেশ ও মহানবী (ছাঃ)-এর আদর্শ অনুযায়ী উত্তীর্ণ হবে তারাই সৌভাগ্যবান। আর যারা আল্লাহ্র আদেশের বিপক্ষে কাজ করে, আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস রাখে না, মহানবী (ছাঃ)-এর আদর্শ মানে না, সীমালংঘন করে তারা অবশ্যই তাঁর পরীক্ষায় অকৃতকার্য হবে।

এ পৃথিবীর জীবনেও প্রায় একই অবস্থার রূপান্তর ঘটে। এখানে নিজ প্রচেষ্টা, অধ্যবসায় ও সাধনার দ্বারা শিক্ষাজীবনের যে কোন পরীক্ষায় অনায়াসে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। কিন্তু যারা শিক্ষা জীবনে পাঠ্যসূচীর বা আদর্শের কোন তোয়াক্কাই করে না, তারা কখনও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারবে না এবং তাদের অনুগামীরাও ব্যর্থ হবে। শুধু শিক্ষাক্ষেত্রে নয়, পার্থিব জীবনের সুখ-শান্তি, ধন-সম্পদ, মান-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি, শৌর্য-বীর্য ইত্যাদির যেকোন ক্ষেত্রে নিজ দায়িত্বই চির উন্নত ভূমিকার অধিকারী।

বলা বাহুল্য, পৃথিবীতে মানুষ নিজে অপরাধ করে অন্যের উপর তা চাপিয়ে দিতে চায় এবং পরজগতেও এই প্রবণতা ক্রিয়াশীল থাকবে। অদৃশ্যের প্রকল্পক বিশ্ব নিয়ন্তা আল্লাহ মানবীয় বৈশিষ্ট্যের অভিভাবক। তাই তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভূমিকায় মানবজাতিকে তার নিজ দায়িত্বের বিশদ বিবরণ পৌঁছে দিয়েছেন এবং আলোচ্য রচনায় পুরাপুরিভাবেই তা প্রতিফলিত হয়েছে। আল্লাহ আমাদের সকলকে পরজগতের কল্যাণে নিজ দায়িত্বের প্রতি পবিত্রভাবে যত্নশীল হওয়ার তওফীক্ব দান করুন- আমীন!!

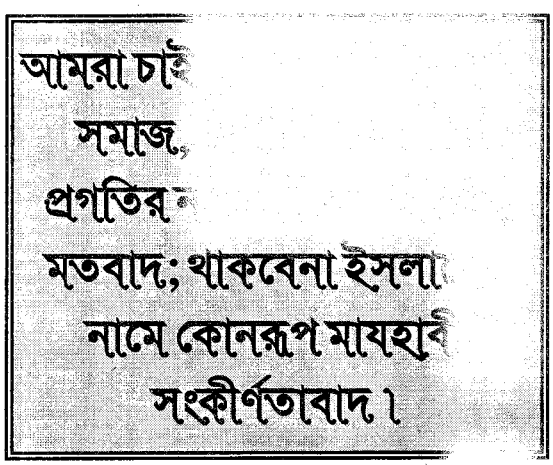

কুরআনের মত একটি গ্রন্থ রচনার সম্ভাবনা প্রসঙ্গে

এ.কে. মোহাম্মদ আলী

বিগত শতাব্দীর আশির দশকে মিছরের কম্পিউটার বিজ্ঞানী ডঃ রাশেদ আল-খলীফা পবিত্র কুরআনকে কম্পিউটারে বাণীবদ্ধ করে অনেক প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল ১৯ সংখ্যার ভিত্তিতে পবিত্র কুরআন রচনা করা সম্ভব কি-না? উত্তরে কম্পিউটার জানায়, এরূপ বুননের মাধ্যমে তা সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা হ'লঃ ৬২৬, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ কুরআনের মত গ্রন্থ ১৯ সংখ্যার ভিত্তিতে রচনা করতে গেলে উপরোক্ত সংখ্যার গ্রন্থ রচনা করতে হবে; তাহ'লে একটি গ্রন্থ পবিত্র কুরআনের মত হ'লেও হ'তে পারে। উল্লেখ্য যে, পবিত্র কুরআনের ১৯ সংখ্যাভিত্তিক গ্রন্থন নিয়ে অনেক বই দেশে ও বিদেশে প্রকাশিত হয়েছে এবং এসব বইয়ের মূল তথ্যসূত্র হ'ল ডঃ রাশেদ আল-খলীফা কর্তৃক কম্পিউটারের মাধ্যমে সৃষ্ট এই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার।

যাহোক, উপরোক্ত সংখ্যাটিকে বলা হয় ৬২৬ সেপ্টেলিয়ন ভাগের এক ভাগ। অর্থাৎ ৬২৬ এর পরে ২৪টি শূন্য দিলে যা হ'ল তার এক ভাগ। এখন কথা হ'ল, আমরা জানি পবিত্র কুরআনে কম-বেশী ৬৬৬৬টি আয়াত আছে এবং ঐ আয়াতগুলিতে কম-বেশী ৮,৬৪,৪৩০টি শব্দ আছে। আর ৮,৬৪,৪৩০টি শব্দ সম্বলিত ৬২৬ সেপ্টেলিয়ন গ্রন্থ রচনা করা এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। তাহ'লে দেখা যাক কিরূপ অবিশ্বাস্য। গণিতবিদরা হিসাব করে দেখেছেন যে, ৮,৬৪,৪৩০টি শব্দ সম্বলিত গ্রন্থ প্রতিদিন যদি একটি করেও রচনা করা হয়, তাহ'লে ৬২৬,০০০,০০০,০০০, ০০০,০০০,০০০,০০০,০০০টি গ্রন্থ রচনা করতে সময় লাগবে ১,৭১৫,০৬৮,৪০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ বছর। কম্পিউটারের মতে ১৯-এর গাণিতিক বুননের ভিত্তিতে পবিত্র কুরআনের মত গ্রন্থ রচনা আকস্মিকভাবে ঘটাতে হ'লে যে সময়ের প্রয়োজন হবে, সে সময়ের মধ্যে বহু লক্ষ কোটি পৃথিবীই নয়; বরং বহু লক্ষ কোটি মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়ে যাবে এবং বহু মহাবিশ্ব লয়ও পেয়ে যাবে। কিন্তু পবিত্র কুরআনের মত গ্রন্থ রচনা করা যাবে না। তাই কম্পিউটার স্বীকার করেছে যে, পবিত্র কুরআনের মত কোন গ্রন্থ রচনা কোন দিনই সম্ভব নয়।

যুগের জ্ঞান প্রসারের সাথে সাথে বর্তমানে এই পবিত্র কুরআন সম্পর্কে নতুন নতুন তথ্য উন্মোচিত হ'তে চলেছে যা মানুষের মাঝে এক ঝলক আলোর রেখা প্রতিফলিত করেছে। পবিত্র কুরআনের শাব্দিক সামঞ্জস্য হ'ল এই আলোর উপাদান। বিষয়টি বিশ্লেষণের জন্য প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ তারেক আল-সুইদান গবেষণালব্ধ কর্মের মাধ্যমে পবিত্র কুরআনে কিছু সামঞ্জস্যপূর্ণ শব্দের সহাবস্থান বের করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি একটি ই-মেইল http://www.ummah.net-এর মাধ্যমে তার প্রকাশিত তথ্যটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন, কুরআনে এমন কিছু শব্দ আছে, যা একটির বিপরীতে অন্য আর একটি শব্দ সমানভাবে বিদ্যমান।

যেমন পুরুষ বা 'রিজাল' শব্দটি পবিত্র কুরআনে এসেছে ২৪ বার। তার বিপরীত শব্দ স্ত্রী বা 'ইমরাআহ' শব্দটিও এসেছে ২৪ বার। একটি কমও নয় বা একটি বেশীও নয়। এ সম্পর্কে আরো কিছু শব্দ তার তথ্য থেকে উদ্ধৃত করা যেতে পারেঃ

(১) আমাদের দুনিয়ার জীবন ব্যবস্থার সাথে আখেরাতের জীবন ব্যবস্থা ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলেই 'দুনিয়া' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ১১৫ বার এবং 'আখেরাত' শব্দটিও ব্যবহৃত হয়েছে ১১৫ বার।

(২) মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে জীবনের সাথে মৃত্যুর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। তাই 'আল-হায়াত' শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে ১৪৫ বার এবং 'আল-মাউত' শব্দও উল্লেখ করা হয়েছে ১৪৫ বার।

(৩) 'মালাইকাহ' শব্দ (ফেরেশতা) বলা হয়েছে ৮৮ বার এবং 'শায়াত্বীন' (শয়তান) শব্দও বলা হয়েছে ৮৮ বার।

(৪) পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, পৃথিবীতে এমন কোন জাতি নেই, যে জাতির কাছে আমি রাসূল পাঠাইনি। সেই সূত্রে 'উম্মাহ্' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ৫০ বার। অনুরূপ 'রাসূল' শব্দটিও উল্লেখ করা হয়েছে ৫০ বার।

(৫) 'ইবলীস' শব্দটি পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে ১১ বার এবং ইবলীস থেকে 'আশ্রয় চাওয়ার জন্য'ও বলা হয়েছে ১১ বার।

(৬) 'মুছীবত' শব্দটি বলা হয়েছে ৭৫ বার। আর মুছীবত থেকে আল্লাহ্র রহমতে উদ্ধারের পর শুকরিয়া আদায় করার জন্য 'শুকরিয়া' শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে ৭৫ বার।

(৭) পবিত্র কুরআনে বিপথগামী জাতির কথা বলা হয়েছে ১৭ বার। আর মহান আল্লাহ্র কাছে বিপথগামী জাতিরাই হচ্ছে মৃত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত। অতএব মৃত জাতির কথা বলা হয়েছে ১৭ বার।

(৮) মুসলমান ও জিহাদ একে অপরের পরিপূরক বলেই কি মহান আল্লাহ 'মুসলিম' শব্দটি ৪১ বার এবং 'জিহাদ' শব্দটিও ৪১ বার ব্যবহার করেছেন?

(৯) 'যাকাত' শব্দটির গূঢ় অর্থ পবিত্রকরণ। এটি ব্যবহৃত হয়েছে ৩২ বার। সম্পদের যাকাত প্রদান করলে মহান আল্লাহ ধন-সম্পদে 'বরকত' প্রদান করেন বলেই কি পবিত্র কুরআনে 'বরকত' শব্দটি উল্লেখ করেছেন ৩২ বার?

(১০) আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ) হ'লেন এই দুনিয়ায় শরী'আহ প্রচলনের মূল। এজন্যই বোধ হয় 'মুহাম্মাদ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ৪ বার এবং 'শরী'আহ' শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে ৪ বার।

সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় হ'ল, আমাদের এই পৃথিবীতে পানি-মাটির অবস্থান। আমরা সাধারণভাবে জানি, পৃথিবীর তিনভাগ জল এক ভাগ স্থল। কিন্তু সূক্ষ্ম হিসাব কেউ জানেন কি? প্রায় ১৫০০ বছর আগে পবিত্র কুরআন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসাব দিয়েছে, তা দেখে আজকের ভূগোলবিদগণ স্তম্ভিত। পবিত্র কুরআনে 'আল-বাহ্র' বা সমুদ্র শব্দটি এসেছে ৩২ বার। তার বিপরীত শব্দ 'আল-বার' বা স্থল-মাটি শব্দটি এসেছে ১৩ বার। অর্থাৎ এই জল-স্থল বা পানি-মাটি অর্থাৎ ৩২+১৩ মিলিয়ে আমাদের এই পূর্ণ পৃথিবী। ৩২+১৩=৪৫ হ'ল ১০০% পৃথিবী। এবার হিসাব কষে পানির পরিমাণ বের করে নিন। সাথে একটি শক্তিশালী ক্যালকুলেটার থাকলে ভাল হয়। পানির পরিমাণ হ'ল ৩২,৪৫×১০০%=৭১. ১১১১ .১১১১। অর্থাৎ পৃথিবীতে পানির পরিমাণ হ'ল ৭১.১১১১.১১১১ ভাগ। এবার মাটির পরিমাণ বের করা যাক। মাটির পরিমাণ ১৩,৪৫×১০০%=২৮.৮৮৮৮. ৮৮৮৯। আর এটাই হচ্ছে সামগ্রিকভাবে জল ও স্থলের সূক্ষ্ম হিসাব যা বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকদের নিকট প্রতিষ্ঠিত।

আল-কুরআনের অলৌকিকত্ব কোনদিনই শেষ হবে না। পবিত্র কুরআনের সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জন মানুষের কাছে সম্ভব কি-না তা মহান আল্লাহই ভাল জানেন। মহান আল্লাহই তাঁর কুরআনের জ্ঞান এবং এর অলৌকিকত্ব ধীরে ধীরে উন্মোচন করবেন। সমপরিমাণ শব্দ সম্ভার দিয়ে এমন অংকের হিসাবে, বিপুল অর্থবোধক অসাধারণ সুন্দর ও লক্ষ্যভেদী কোন বই বা গ্রন্থ রচনা করা একমাত্র মহান আল্লাহ ছাড়া আর কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। এজন্যই পবিত্র কুরআন অলৌকিক। এজন্যই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন, 'বল তোমরা ভেবে দেখছ কি, যদি এই কুরআন আল্লাহ্র নিকট হ'তে অবতীর্ণ হয়ে থাকে (আসলে বাস্তবেও এটাই)। আর তোমরা ইহা প্রত্যাখ্যান কর, তবে যে ব্যক্তি ঘোর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত, তার অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে'? 'আমি তাদের জন্য আমার নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করব। বিশ্ব জগত ও তাদের নিজেদের মধ্যে। ফলে তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, উহাই (আল কুরআন) সত্য' *(ফুচ্ছিলাত ৫২-৫৩)*।

পরিশেষে পবিত্র কুরআন যে অলৌকিক তা এই বিশ্বলোকে ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে মানুষের মাঝে। কারণ আল্লাহ্র বাণীর কোন পরিবর্তন নেই *('লা তাবদীলা লি কালিমাতিল্লা-হ')*।

[সংকলিত]

দিশারী

কেন এমন হয়?

মানুষ সৃষ্টির মূলে রয়েছে এক পুরুষ ও এক নারী। ফলে সকল মানুষের এক ভাষা ও এক ধর্ম হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু বাস্তবে মানুষে মানুষে আকৃতি, বর্ণ, ভাষা, ধর্ম, পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-আচরণগত দারুণ পার্থক্য বিদ্যমান। পার্থক্যদৃষ্টে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। পার্থক্যের কারণে মানুষ যে এক পুরুষ ও এক নারী হ'তে এসেছে, একথা একান্ত সত্যি হ'লেও অযৌক্তিক হয়ে যায়। একজন শ্বেত ও একজন কৃষ্ণবর্ণের লোককে পাশাপাশি দাঁড় করালে পার্থক্য আকাশ-পাতালে দাঁড়িয়ে যায়। তবে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের মতে সাদা ও কালো চামড়ার নীচে প্রবাহমান যে রক্তধারা রয়েছে, রাসায়নিক বিশ্লেষণে তাতে কোনই পার্থক্য নেই। কিন্তু মানুষের জ্ঞান মানুষকে ঐক্যের দিকে টানলেও মানুষ তা মেনে নিচ্ছে না। এখানেই সমস্যা।

বিশ্বের সকল মানুষ ও জিন জাতিকে মহান আল্লাহ পাক একই উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। সেই উদ্দেশ্য হ'ল, সবাই একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করবে *(যারিয়াত ৫৬)*। সকলকে কম-বেশী জ্ঞান-বিবেক দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। ভাল-মন্দ ধর্ম-অধর্ম বুঝার মত শক্তিও তিনি দান করেছেন। এতদসত্ত্বেও প্রত্যেকটি ব্যাপারে মতপার্থক্য বিদ্যমান। এখানে আমি ধর্মগত পার্থক্যকে অবলম্বন করে কিছু কথা বিবৃত করতে চাই।

দুনিয়াতে মানুষের ভাষার শেষ নেই, ধর্মেরও শেষ নেই। কিন্তু আমরা মুসলিম জাতি হিসাবে এ বিশ্বাস পোষণ করি যে, মহাগ্রন্থ আল-কুরআন অবতীর্ণ হবার পর পৃথিবীতে প্রচলিত সকল ধর্ম বাতিল হয়ে গেছে। কেননা মহান আল্লাহ পাক তাঁর পবিত্র বাণীতে বলেছেন, 'ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম' *(মায়দাহ ৩)*। তিনি এ ব্যাপারে আরো বলেছেন, 'তিনি প্রেরণ করেছেন তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও হক্ব দ্বীনসহ, যাতে বিজয়ী করেন সকল দ্বীনের উপর, মুশরিকদের তা ভাল না লাগলেও' *(তওবাহ ৩৩)*। এ ছাড়া বলা হয়েছে, 'ইসলামই আল্লাহ্র নিকটে একমাত্র মনোনীত ধর্ম' *(আলে ইমরান ১৯)*। তিনি মানুষকে ভীতি প্রদর্শন করে বলেছেন 'কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীনের কামনা করলে তা গ্রহণ করা হবে না, সে হবে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত' *(আলে ইমরান ৯৫)*। আল্লাহ বিশ্বের সকল মানুষকে ইসলাম গ্রহণে আহ্বান করেছেন। কিন্তু বিশ্বের অধিকাংশ মানুষই তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয়নি। তারা অস্বীকারকারী জাতি হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় আইনে আমরা দেখি, শাসক পরিবর্তনের সাথে সাথে আগের অনেক আইন-কানুন বাতিল হয়ে যায়। বাতিল আইন মানুষ মেনে চলে না। যদি মানা হয়, তাহ'লে

সেটা দোষনীয় হয়ে যায়। তদ্রূপ মহাগ্রন্থ আল-কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর পৃথিবীর যাবতীয় প্রচলিত ধর্ম বাতিল হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে আর কোন দ্বিমত থাকতে পারে না। তথাপি মানুষ সেগুলি পালন করছে। এতে ফল কখনও শুভ হবে না, সেকথা আল্লাহ পাক স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করেছেন।

এক্ষণে এক ইসলাম ধর্মের দিকে দৃষ্টি ফিরাই। মুসলিম জাহান শী'আ ও সুন্নী এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত। শী'আদের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য শাখা-প্রশাখা। সুন্নীদের মধ্যেও ৪টি মাযহাব ও 'আহলেহাদীছ' নিয়ে পাঁচটি প্রধান ভাগ। এছাড়া মুসলমানগণ অসংখ্য বিদ'আতী দলে উপদলে, নামে উপনামে বিভক্ত হয়েছে। অথচ আল্লাহ্র আদেশ, 'তোমরা আল্লাহ্র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না' *(আলে ইমরান ১০৩)*। মুসলিম জাতিকে ঐক্যবদ্ধ সুসংহত জাতি হিসাবে পৃথিবীতে অবস্থানের জন্য প্রিয় নবী কত সুন্দর কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'দলচ্যুত ভেড়াকে নেকড়ে বাঘে খায়'। ঐক্যহীনতার কারণে মুসলিম জাতি বিজাতীদের কাছে চরমভাবে লাঞ্ছিত হচ্ছে। আমার মনে এ বিশ্বাস দানা বেঁধেছে যে, বিজাতীরা মুসলিম জাতির কাছে আগের পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলতে বদ্ধপরিকর। নইলে এমনটি হবে কেন? এত মানবিক গুণাবলীর কথা বলা হচ্ছে এবং গণতন্ত্র গণতন্ত্র বলে চীৎকার করা হচ্ছে, মানবিক গুণাবলীর ধ্বজাধারী গণতন্ত্রের ঢাকঢোল পিটানো ব্যক্তিরাই বিশ্বে সবচেয়ে অমানবিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রিয় নবী মুসলিম জাতির ঐক্যের বিষয়টি চরমভাবে উপলব্ধি করেছেন যে, তাঁর উম্মত এক ও ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসাবে টিকে থাকবে না এবং এজন্য তিনি ভবিষ্যদ্বানী করেছেন, 'ইহুদীরা ৭১ দলে বিভক্ত হয়েছে, খ্রীষ্টানরা হয়েছে ৭২ দলে, আর আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে এ প্রসঙ্গে তিনি যে মারাত্মক কথা উচ্চারণ করেছেন, সেটির প্রতিই বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। তিনি বলেছেন, 'এসব দলের মধ্যে একটি দলই মাত্র জান্নাতী'। প্রশ্ন হ'ল, তারা কারা? উত্তর এল, 'আমি ও আমার ছাহাবীরা যে পথে আছি, সে পথের অনুসারীরা'। এজন্য মুসলিম বলে দাবীদার সকলকে তাঁর পথ অনুসরণ করতে হবে।

প্রিয় নবীজি তাঁর প্রবর্তিত ধর্মকে কুলষিত না করার জন্য বিধি-বিধান বেঁধে দিয়েছেন। তিনি কঠোরভাবে বলেছেন, 'তাঁর ধর্মে কোন কিছু সংযোজন করা হ'লে তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য'। অথচ আমরা দেখতে পাই, তিনি যে আমল করেছেন, তার অতিরিক্ত আমল প্রতিপালন করা হয়ে থাকে। এই অতিরিক্ত আমল পরিহার করতে বলা হ'লে আমলকারীরা সে আমল তো পরিহার করছে না, উপরন্তু পরিহার করতে বলা ব্যক্তির উপর আক্রোশে ফেটে পড়ে। তারা একটুও ভেবে দেখে না যে, কথাটা যথার্থ কি-না? তাই অতিরঞ্জিত আমল শরী'আতের দৃষ্টিতে বিদ'আত বলে সাব্যস্ত। অথচ তা উচ্ছেদ হচ্ছে না। কারণ এর মূলে রয়েছে অন্ধ বিশ্বাস।

অন্ধ বিশ্বাসের শত শত উদাহরণের মধ্যে আমি একটি পেশ করতে চাই। এদেশে অন্ততঃ তিন-চতুর্থাংশ মৃত ব্যক্তিকে বিনা ফাতিহায় জানাযা করে দাফন করা হয়ে থাকে। আমার জানামতে কোন হাদীছের আলোকে এ কাজ করা হয় না। আমি একদিন জনৈক শিক্ষিত ব্যক্তিকে মাওলানা মোঃ আজিজুল হক কর্তৃক অনূদিত বোখারী শরীফের মুখবন্ধে 'বোখারী শরীফকে কুরআন শরীফের পর বিশুদ্ধতার দিক থেকে শীর্ষস্থানীয়' উল্লেখ দেখিয়ে জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়ার ৬৯৫ নং হাদীছটি দেখালাম এবং প্রশ্ন করলাম, 'আপনারা কেন সূরা ফাতিহা না পড়ে মৃত ব্যক্তিকে সমাধিস্থ করেন'? লোকটি উত্তরে বলল, 'যে ছালাতে রুকূ নেই, সিজদা নেই, সে ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে না'। আমি তাকে পুনরায় প্রশ্ন করলাম, 'এ কথা কোন্ হাদীছগ্রন্থে আছে'? লোকটি বলল, 'এটি ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর অভিমত। তাঁর অভিমতের উপর নির্ভর করেই আমরা ধর্মীয় আমলগুলি পালন করে থাকি'। আমি বললাম, 'প্রিয় নবীর বাণী ছাড়া কোন মহাত্মার বাণীকে ধর্মের বিধি-বিধান হিসাবে প্রতিপালন করা যাবে কি? লোকটি বলল, 'এদেশের বেশির ভাগ লোকই তো তাঁর কথামত চলে, বেশিরভাগ লোকই কি তাহ'লে ভুল করছে'? আমি বললাম, কুরআন ও হাদীছের আলোকে তা-ই প্রতীয়মান হয়।

অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গেছে, 'কেন এমন হয়' এর উত্তর। তথাপি বলি, দেশের অধিকাংশ মুসলিম জনগণই ইমাম আবু হানিফাকে অতিমাত্রায় মান্য করে চলে। কিন্তু তারা একথা কখনো ভেবে দেখে না যে, প্রিয় নবীর বাণী উপেক্ষিত হচ্ছে। নবীর বাণীকে উপেক্ষার অর্থ, নবীকে উপেক্ষা করা মৌখিকভাবে নবীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হ'লেও। নবীর প্রশংসায় সবাই গদগদ অথচ আমলে বিপরীত।

তাই পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে আমাদের যাবতীয় ধর্মীয় আমল এবং দুনিয়াবী কাজও পালন করার জন্য বিশ্বের সকল মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দকে আমি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। যদি আমরা তা পালন করি, তবে আমরা পূর্বেকার সুমহান জাতিতে পরিণত হ'তে পারব ইনশাআল্লাহ। আসুন! মুসলমানদের এ চরম সংকটময় মুহূর্তে ধর্মীয় সব ফের্কাবন্দী ভুলে মহান আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর আদেশ পালন করে দুনিয়াতে আমাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে তৎপর হই। মহান আল্লাহ আমাদের অন্তরে ঐক্যবদ্ধ মুসলিম জাতিতে পরিণত হবার অনুপ্রেরণা দান করুন। আমীন!

❐ *মুহাম্মাদ আতাউর রহমান*
সাং- বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

চিকিৎসা জগৎ

আর্সেনিকঃ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে এর ভূমিকা

*ডাঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ভূঁইয়া**

আর্সেনিক একটি বিষাক্ত পদার্থ। প্রাচীন কাল হ'তে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আর্সেনিকের বিভিন্ন যৌগ বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আধুনিক কালেও এর ব্যবহার আরো বিস্তার লাভ করেছে। কারণ কঠিন, তরল ও বায়বীয় এই তিন অবস্থাতেই আর্সেনিকের অবস্থিতি বা প্রাপ্তি বিরাজিত। প্রায় কম-বেশী সব খনিজ পদার্থেই আর্সেনিক বিদ্যমান। এ পর্যন্ত ২৫০টি খনিজ পদার্থের মধ্যে আর্সেনিকের উপস্থিতি শনাক্ত হয়েছে এবং আরো গবেষণা চলছে।

সূক্ষ্ম বিষক্রিয়া (Acute poisoning)ঃ আর্সেনিক হ'ল একটি সাধারণ আদি প্রাণরসীয় বিষ (Protoplasmic poison)। এটি সমস্ত শরীরের তন্ত্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ন্যূনতম ১০০ মিঃ গ্রাম আর্সেনিক একত্রে শরীরে প্রবেশ করলে তাৎক্ষণিক সূক্ষ বিষক্রিয়া বা স্বল্প মেয়াদী বিষক্রিয়া (Acute poisoning) হ'তে পারে।

আর্সেনিকের যৌগ সমূহ বিষাক্ত। তবে সাদা আর্সেনিক (As203) সবচেয়ে বেশী বিষাক্ত। এইরূপ আর্সেনিকের ০.১২ থেকে ০.২৫ গ্রাম পরিমাণ মাত্রা একজন মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়ে থাকে। আর্সেনিক এমন একটি বিষ যার কোন গন্ধ নেই বা খাওয়ার সময়ও তাৎক্ষণিকভাবে টের পাওয়ার উপায় নেই। নেপোলিয়নের মৃত্যুর বহু বছর পর তার চুল পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছিল, তাকে আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় মারা হয়েছিল। সুতরাং একত্রে বেশী মাত্রায় আর্সেনিক গ্রহণে তাৎক্ষণিক মৃত্যুর কারণ হ'তে পারে।

লক্ষণঃ অল্প মাত্রায় দীর্ঘ বছর সেবনে প্রথমে সূক্ষ বিষক্রিয়ার লক্ষণ হ'ল, প্রচন্ডভাবে বমি হওয়া, ডায়রিয়া, অনিদ্রা, পেট ব্যাথ্যা, মাথা ব্যাথা, মাংসপেশী ব্যাথা, মুখমণ্ডলে ইডিমা, হৃদপিন্ডের অস্বাভাবিকতা ইত্যাদি।

কিভাবে আর্সেনিক শরীরে প্রবেশ করেঃ খাদ্য ও পানীয় জলের মাধ্যমে আর্সেনিক শরীরে প্রবেশ করা ছাড়াও শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে আর্সাইন স্যাস ফুসফুসে প্রবেশ করতে পারে। আর্সেনিক উদ্ভূত দ্রব্যাদি ব্যবহৃত কল-কারখানায়, কয়লার খনিতে, কয়লার বিভিন্ন খনিজদ্রব্য সংক্রান্ত কারখানায় যারা কাজ করে, তাদের আর্সেনিক গ্রহণের প্রবেশ পথ হ'ল মুখ ও নাসারন্ধ্র। সুতরাং ফুসফুসের মাধ্যমেও অনেকের শরীরে আর্সেনিক প্রবেশ করে থাকে। অধিক আর্সেনিক যুক্ত পানি দিয়ে গোসল করলেও ত্বকে ও চুলে আর্সেনিক জমা হয়। তামাক গাছ ও মফি থেকে আর্সেনিক গ্রহণ করে। ফলে একজন যুবক ধূমপানের মাধ্যমে প্রতিদিন সর্বোচ্চ ২০ মাইক্রোগ্রাম আর্সেনিক গ্রহণ করে থাকে। আর্সেনিকযুক্ত ক্রিম, মলম, পাউডার রঙ ব্যবহার করলেও ত্বকে শোষিত হয়।

আর্সেনিক বিষে আক্রান্ত হ'লে বংশগতি পরিবর্তন হয়ঃ আর্সেনিকের বিষক্রিয়াতে কোষের প্রাণ কেন্দ্রে অবস্থিত ক্রমোজোমের ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিয়েসের (DNA) নাইট্রোজেন ক্ষারকগুলি (A=T, G=C) ভেঙ্গে ফেলে বংশগতি বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করতে পারে। মানুষের দেহে আর্সেনিক প্রবেশ করণের কারণে সৃষ্ট ত্বকের ক্যান্সারযুক্ত রোগীর ক্ষেত্রে দেখা গেছে, সিসটার ক্রোমেটিড বিনিময় হ'তে (Sister chromatid Exchange) ক্রোমোজোম ও মাইক্রোনিউক্লিয়াই ভেঙ্গে যাচ্ছে।

আর্সেনিকের সাথে খাদ্য ও পুষ্টির বিষক্রিয়া কিভাবে ঘটেঃ কিছু পানির জন্য আর্সেনিক আবশ্যক হ'লেও মানুষের শরীরে এর আবশ্যতা নেই বা থাকলেও খুবই সীমিত। কিছু ভিটামিন (A,C,E, B12 Folic Acid), কিছু মৌলিক পদার্থ (জিংক, কপার, সেলেনিয়াম) মানুষের শরীরে আর্সেনিক বিষক্রিয়া বিনাশ করে থাকে। খাদ্যের সাথে বেশি প্রোটিন ও মিথিওনিন উপস্থিত থাকলে মিথাইলেশন প্রক্রিয়া বৃদ্ধি পায়। ফলে শরীর থেকে আর্সেনিক নিঃসারিত হয়।

আর্সেনিক কোথায় বেশী জমা হয়ঃ আর্সেনিক বিষ অধিক মাত্রায় বেশি দিন গ্রহণে শরীরের ধারণমাত্রা বৃদ্ধি পায়, যা নখ, চুল, ত্বকে প্রধানত বেশী জমা হয়। বিগত তিন দশক যাবত রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারের ফলে পরিবেশচক্র, বায়ুচক্র ও দুষণচক্র জনিত কারণে অন্যদেশের পাশাপাশি বাংলাদেশেও আর্সেনিক বিষাক্ততা (Poisoning) প্রবল আকার ধারণ করছে এবং সাধারণ মানুষের মনে আতঙ্ক বিরাজ করছে। বাংলাদেশের অসংখ্য মানুষ আর্সেনিক বিষের যন্ত্রণায় ভুগছে। গত ০৪-০৪-২০০২ ইং তারিখে ব্যাঙ্ককে এশীয় বিশেষজ্ঞদের বৈঠকে এক প্রতিবেদনে জানানো হয় যে, এর ফলে ক্যান্সার দেখা দিতে পারে। 'বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা'র পরিবেশ রক্ষার পরিচালক ডঃ রিগর্ড হলেমার এ তথ্য জানিয়েছেন। আরও জানিয়েছেন যে, শিশু আর্সেনিকে আক্রান্ত হ'লে বয়সকালে সে ক্যান্সারে আক্রান্ত হ'তে পারে।

আর্সেনিক মানবদেহে কি কি রোগ সৃষ্টি করতে পারেঃ আর্সেনিক এমন একটি বিষ, যা মানুষের শরীরের প্রতিটি অর্গান, সেল এবং সিস্টেমকে ধ্বংস করে মানুষকে অকাল মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। যেমন-

(ক) রক্তের উপরে ক্রিয়াঃ লিউকেমিয়া বা ব্লাড ক্যান্সার, বিশেষ করে শিশুদের বোনমেরু প্রদাহ মিলফো সারকোমা (Malignant lung Tumor's) গর্ভস্থান সন্তান উৎপত্তিতে বিঘ্ন সৃষ্টি বা শিশুর ক্ষতিসাধন। নার্ভাস সিস্টেম, হার্ট এবং সার্কুলেশন গ্যাস্ট্রো ইনটেস্টাইনাল ক্যানেল, কার্সিনোমা, লিমফো কার্সিনোমা হারের বৃদ্ধি, একক সেলের উপর

প্রতিক্রিয়া। যেমন- এনথ্রাক্স জীবানু, টাইফয়েড, ষ্ট্রেপটোকক্কাস, ষ্টেফাইলো কক্কাস, ই-কোলাই (E-coli) প্রোটোজোয়া যে কোন ধরনের চর্মপীড়া যেমন- শ্বেতকুষ্ঠ, কেশহীনতা, সোরায়সিস, ইপিথেলিওমা, সিরাস, পা ও হাতের তালুতে কড়া, ত্বকের ক্যান্সার, লিভার, ফুসফুসের ক্যান্সার, কিডনী ক্যান্সার, মূত্রথলীর ক্যান্সার ইত্যাদি সৃষ্টি করে।

(খ) মানসিক বিপর্যয়ঃ মানসিক ভীতি ও অস্থিরতা, মৃত্যুভয়, নিরাশসহ আত্মহত্যার প্রবণতা ইত্যাদি।

চিকিৎসাঃ হ্যানিম্যানের সময়কাল থেকেই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতিত আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসায় সাফল্যজনকভাবে ভূমিকা রেখেছে। শুধু তাই নয় নির্দিষ্ট 'আর্সেনিক' ঔষধ সহ প্রায় তিন সহস্রাধিক ধরনের ঔষধ রয়েছে, যা সূক্ষ্মমাত্রায় প্রয়োগ করে আর্সেনিকের তরুণ, পুরাতন ও দীর্ঘস্থায়ী বিষক্রিয়ার কুফল নিরাময় করা সম্ভব।

সুতরাং এ পদ্ধতির দ্বারা রোগ আরোগ্য, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও আর্সেনিক বিষক্রিয়ার যাবতীয় দোষ নিরাময় করা সম্ভব। বাংলাদেশে ভয়াবহ আর্সেনিক বিষক্রিয়ার সমস্যা ও প্রতিকারে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞান যথার্থ ভূমিকা পালন করে চলেছে। হোমিওপ্যাথিক মতে 'আর্সেনিক'কে জীবন রক্ষা করা ঔষধ বলা হয়।

আর্সেনিক কিভাবে কাজ করে? আর্সেনিক বিভিন্ন টিস্যু, সেল ও ক্যাপিলারীর উপর ফসফরাস সদৃশ কাজ করে অক্সিজেন (O_2) জারণ প্রক্রিয়া কমিয়ে দেয়, ফলে সেল, প্রোটিন ভেঙ্গে যায় এবং নেক্রোসি শুরু হয়ে যায়।

"The hypothes of bing and H Schulg that the cell damage occurs through the oxydation of Arsenious acid to arsenic acid again reversely by reduction of arsenic acid to arsenious Acid.

আর্সেনিক মানবদেহের বিভিন্ন সিস্টেম, অর্গ্যান এর কি কি কার্যকরী ভূমিকা রাখে তার দিক-নির্দেশনায় পাওয়া যায় যে, বৃহৎ পরিমাণ এমনকি অল্প পরিমাণে আর্সেনিকও ষ্টেপটোকক্কাস, ষ্ট্যাফাইলোকক্কাস, ইকোলাই, ভিবরি ও কলেরা, টাইফয়েড ব্যাসিলাইকে ক্ষতিগ্রস্থ করে ধ্বংস করতে সক্ষম।

কেমোথেরাপী (Chemotheropy)ঃ কেমোথেরাপীতে প্রটোজেয়ার উপর বহুল পরিমাণের আর্সেনিক তৎক্ষণাৎ এবং মধ্যম পরিমাণের আর্সেনিক দেরীতে ক্রিয়া করে মৃত্যু ঘটায়। কিন্তু অতি অল্প পরিমাণের আর্সেনিক প্রোটোজায়ার বৃদ্ধি ঘটায়। প্রচলিত ব্যবহার (Customary uses) রক্তদৃষ্টি দুর্বলতা, শুকিয়ে যাওয়া এবং চর্মরোগে আর্সেনিক প্রথম থেকেই বহুল পরিমাণি ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

ক্ষেত-খামার

সোহরাওয়ার্দী আজ এক আত্মনির্ভরশীল যুবক

দিনাজপুর যেলার বোচাগঞ্জ উপযেলার প্রত্যন্ত গ্রাম ছাতাইলের দরিদ্র বেকার যুবক মুহাম্মাদ হোসাইন সোহরাওয়ার্দী আজ এক আত্মনির্ভরশীল যুবক। বর্তমানে তার মাসিক আয় গড়ে ৪৭ হাযার টাকা। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে ও পরবর্তীতে প্রকল্প গ্রহণ করে আজ তিনি স্বাবলম্বী।

বিবরণে প্রকাশ, যেলার বোচাগঞ্জ উপযেলার ছাতাইল গ্রামের মুহাম্মাদ হাফীযুদ্দীনের পুত্র মুহাম্মাদ হোসাইন সোহরাওয়ার্দী এইচএসসি পাস করার পর অর্থাভাবে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেনি। বাবা একজন প্রান্তিক চাষী হওয়ায় কৃষি হ'তে সামান্য আয় দিয়ে সংসার চালানো কষ্টকর বিষয়টি সোহরাওয়ার্দীর দৃষ্টি এড়ায়নি। সংসারের জন্য কিছু করতে হবে এ চিন্তা তার মনে সব সময় ছিল। এমন সময় তার এলাকার কিছু যুবকের মৎস্য খামার দেখে তারও আগ্রহ জাগে মৎস্য খামার করার। সে খামারের মালিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে জানতে পারে যুব উন্নয়নের বিভিন্ন কার্যক্রমের কথা। ফলে গত ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর দিনাজপুর যেলা কার্যালয় কর্তৃক আয়োজিত মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে এবং পরবর্তীতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, বোচাগঞ্জ উপযেলা কার্যালয় হ'তে যুব ঋণসহ চাচার কাছ থেকে আর্থিক সহযোগিতা পেয়ে দু'টি পুকুরে মৎস্য চাষ শুরু করে। প্রকল্প শুরুর প্রথমদিকে তেমন আয় করতে পারেনি সোহরাওয়ার্দী। কিন্তু তার মনোবল হারায়নি। কঠোর পরিশ্রম ও দৃঢ় মনোবল দিয়ে সে তার অভিজ্ঞতাকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে এখন সে স্বাবলম্বী।

বর্তমানে তার মাসিক আয় গড়ে প্রায় ৪৭ হাযার টাকা। তার পিতার সংসারের দায়দায়িত্ব এখন তার কাঁধেই। তাছাড়া সোহরাওয়ার্দী বর্তমান অর্থবছরে বোচাগঞ্জ উপযেলা 'জাতীয় মৎস্য পক্ষ ২০০৩'-এর সফল মৎস্য চাষী হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন।

সোহরাওয়ার্দীর মৎস্য খামারটি এলাকায় বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এলাকার বেকার যুবকগণ প্রতিনিয়ত তার বাসায় ও প্রকল্প এলাকায় ভিড় জমাচ্ছে কিছু পরামর্শ ও তার সাফল্যের কাহিনী শোনার জন্য। তার সাফল্যে গর্বিত এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। এছাড়াও তিনি প্রাথমিকভাবে এ বছর বাড়ীতে ৫টি গাভী নিয়ে ডেইরী প্রকল্প চালু করেছেন। সেখান থেকেও তিনি মোটামুটি ভাল আয় করেন। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তাকে দিয়েছে এ সাফল্য-এ কথা আজ তার এলাকার সবার মুখে মুখে।

কবিতা

হিতোক্তি

-আহসান হাবীব
রাঘবেন্দ্রপুর, বিনোদনগর
নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

ওরে মুসলিম মিল্লাত!
জাগো, জেগে দেখ,
তোমার দেহকোণে
দংশিয়াছে জল্লাদ।
কত দিন রবে ঘুমের ঘোরে
তুমি গণ্ডশৈলার মত মরে
কবে জাগিবে সেই ভোর
যে দিন কাটিবে তোমার নিদ্রা ঘোর,
কবে হবে নিশির শেষ
জাগিবে প্রভাত?
ওরে মুসলিম মিল্লাত!
জাগো, জেগে দেখ,
তোমার দেহকোণে
দংশিয়াছে জল্লাদ।

তুমি কি ডুবুরী,
নাকি অতলের প্রবাসী?
ওরে শিউরে উঠো তুমি
আজ ভাসমান তরী
তুমি ধ্বজাধারী
সোদর-সহোদর
নিঃশেষ করিল মারি
কত খানদান কত অভিজাত,
ওরে মুসলিম মিল্লাত!
জাগো, জেগে দেখ,
তোমার দেহকোণে
দংশিয়াছে জল্লাদ।

ন্যায়হীন অন্যায়ের হাহাকার
নেইতো নেই বিচার নেই
শুধু অবিচারের পারাবার
নিরুপায় যারা পদতলে
ভেসেছে নয়ন জ্বলে
করছে পারাপার
কত নমরূদ কত শাদ্দাদ,
ওরে মুসলিম মিল্লাত!
জাগো, জেগে দেখ,
তোমার দেহকোণে
দংশিয়াছে জল্লাদ।

এখনো কি জাগল না!

জাগল না!! সেই ভোর
যবে কাটিবে তোমার তন্দ্রা ঘোর
বল না একবার বল
তুমি কি জাগবে না, নাকি উঠবে না!
ওহে! ওঠো, উর্ধ্বগগনে তুমি উঠো
তুমি হরিয়াল তুমি হরিতাল
মেলাও তোমার লোচন পাতা
বিলাও তুমি ইসলামের কথা,
দাও, দাও তুমি নিঃশেষ করে দাও
অন্যায়-অসত্যের ঝংকার
ছড়িয়ে দাও তুমি সত্যের হুংকার
ভেঙ্গে দাও নমরূদের লৌহ কপাট
তুমি শাদ্দাদের যত শির
ছুড়ে মেরে তীর
তুমি রণবীর
তুমি চির উন্মাদ
ওরে মুসলিম মিল্লাত!
ওরে মুসলিম মিল্লাত!

সন্ত্রাস

-নাছরুল্লাহ আল-ক্বাদীর
কেশবপুর আলিয়া মাদরাসা
কেশবপুর, যশোর।

নামটি বড় ভয়াবহ
জীবন করে নাশ!
জায়গা-জমি দখল করতে
লাগেনা কোন পাস।
সন্ত্রাস!
রসাল মানুষ হারায় রস
সুস্থ মানুষ পায় যে কাশ।
দিন-দুপুরে মানুষ ধরে
গলাতে দেয় ফাঁস।
সন্ত্রাস!
রাস্তাঘাটে মানুষ ধরে
টাকা-পয়সা নেয় যে কেড়ে
জোর-যুলম করলে পরে
বুকে ধরে ব্রাশ।
সন্ত্রাস!
কেউবা বুকে ছুরি মারে
কেউবা মারে পকেট
কেউবা আবার চাকু দিয়ে কাটে
হাযার টাকার জ্যাকেট
কেউবা বুকে ছুরি মেরে
জীবন করে নাশ।
সন্ত্রাস!

ওরা

-নাজমুন নাহার
পলাশবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়, দিনাজপুর।

পথের ধারে ঘুমায় ওরা
নাঙ্গা আদুল গায়
মলিন মুখে একটু আশায়
ছোটে ডান ও বায়।
ওরা যখন শীতের চোটে
ঠক-ঠকিয়ে কাঁপে
সবাই তখন পরম সুখে
গতর লুকায় লেপে।
অন্ন কষ্টে দিন কেটে যায়
মুক্ত গগন তলে
আবাস ভূমি নেই তো ওদের
তাই তো ভিজে জলে।
ওরা শুধু কেঁদে বেড়ায়
হাটে-ঘাটে-মাঠে
ছিন্ন কাপড়, মলিন বদন
থাকে সাথে সাথে।
রোগে-শোকে পায়না সেবা
ধুকে ধুকে মরে
জীর্ণ শরীর নিয়েই তবু
জীবন যুদ্ধ করে।

সোনামণি

গত সংখ্যার সঠিক সঠিক উত্তরদাতাদের নামঃ

দেবীদ্বার, কুমিল্লা থেকেঃ নাজমুল হাসান ভূইয়া।
বুড়িচং, কুমিল্লা থেকেঃ তামান্না।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ধাঁধার আসর)-এর সঠিক উত্তর

১. 'ফুটবল' থেকে 'ফুল'।
২. 'আকবর' হ'তে 'কবর'।
৩. 'ইংলিশ' থেকে 'ইলিশ'।
৪. পানি হ'তে 'পা'।
৫. চাদর, চার, চাদ, চা।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (প্রাণী জগত)-এর সঠিক উত্তর

১. কুকুর। ২. বাজপাখি বা ফ্যালকন।
৩. চিতা বাঘ। ৪. ম্যানাতি। ৫. কুকুর।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (অংক)

১। ১ হ'তে ৪৯ পর্যন্ত সংখ্যাগুলির গড় কত হবে?
২। ৫+১১+১৯+২৯+..... কত হবে?
৩। ২৫ হ'তে ৫৫-এর মধ্যে কয়টি মৌলিক সংখ্যা আছে?
৪। কোন্ সংখ্যার ৯ গুণ থেকে ১৫ গুণ ৫৪ বেশী?
৫। ২০২১-এর মধ্যে ২৭ কতবার আছে?

মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান

গত ডিসেম্বর '০৩ সংখ্যা 'আত-তাহরীক'-এর প্রচ্ছদে একটি মসজিদের ছবি আছে। ছবিটির বামপাশে মসজিদের ছায়া দেখা যাচ্ছে। প্রশ্ন হ'লঃ

১. মসজিদটির মেহরাব কোন্ দিকে?
২. ছবিটি কোন সময় তোলা?
৩. ঐ সমজিদের দেশটি (সেনেগাল) ২০০২ সালে একটি কাজে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। কাজটি কি?
৪. দেশটি কোন্ ধর্মাবলম্বী প্রধান দেশ?
৫। দেশটিতে কোন পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থা চালু আছে?

হাফেয মুহসিন
আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সোনামণি সংবাদ

প্রশিক্ষণঃ

ভাঁড়ালীপাড়া, রাজশাহী ২৪ ডিসেম্বর বুধবারঃ অদ্য বাদ আছর ভাঁড়ালীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মহানগরীর সোনামণি ফেরদাউসের কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সোনামণি প্রশিক্ষণ শুরু হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক ইমামুদ্দীন। তিনি সোনামণিদের মানসিক বিকাশের প্রয়োজনীয় বিষয়, সোনামণি সংগঠনের গুরুত্ব, সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অন্যান্যদের মধ্যে প্রশিক্ষণ দেন সোনামণি মারকায শাখার স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক হুমায়ুন কবীর ও অত্র শাখার উপদেষ্টা সাইফুল ইসলাম।

চাঁদমারী, পাবনা ২৬ ডিসেম্বর '০৩ শুক্রবারঃ অদ্য যেলার চাঁদমারী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সকাল ৯-টা ১৫ মিনিট হ'তে সোনামণি যাকিয়া খাতুনের কুরআন তেলাওয়াত ও আনোয়ার হুসাইন-এর জাগরণী পরিবেশনের মাধ্যমে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস। তিনি সোনামণি সংগঠনের কর্তব্য, চরিত্র গঠন ও সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন যেলা 'সোনামণি' পরিচালক মাওলানা আব্দুল কাদের। অন্যান্যদের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'সোনামণি' আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া শাখার প্রচার সম্পাদক হাফেয হাবীবুর রহমান, চাঁদমারী আহলেহাদীছ জামে মসজিদ শাখার পরিচালক ও অত্র মসজিদের ইমাম মাওলানা বেলালুদ্দীন, যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক এস, এম তারেক্ব হাসান প্রমুখ। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন অত্র যেলার সোনামণি সহ-পরিচালক মুনীরুল ইসলাম। উক্ত অনুষ্ঠানে আন্দোলন, যুবসংঘ ও সোনামণি সংগঠনের অন্যান্য দায়িত্বশীলগণ ও সুধীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আজকের সোনামণি

মুহাম্মাদ মাছূম খান
পলাশী, রাজশাহী।

আজকে যারা সোনামণি
সামনে বড় হব।
ভাবতে হবে কেমন করে
ন্যায়ের পথে চলব।
কেমন করে নবীর কথা
লোকের কাছে বলব?
আজকে যারা সোনামণি
ভবিষ্যতের আশা
কেমন হওয়া দরকার মোদের
চলা, ফেরা, কথা।
আজকে যারা সোনামণি
সামনে এগিয়ে যাচ্ছি।
ভাবতে হবে কার পাঠানো
খাবার মোরা খাচ্ছি?

***

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করুন

-আমীরে জামা'আত

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে কাদিয়ানীদের বই-পত্র ও প্রকাশনা নিষিদ্ধ করার জন্য সরকারকে অভিনন্দন জানান এবং অনতিবিলম্বে তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণার জন্য জোট সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, কালেমায়ে শাহাদাতের ২য় অংশকে অস্বীকার করে যারা নতুন একজন ভণ্ডকে নবী বলে দাবী করে, তারা নিঃসন্দেহে 'কাফির'। বৃটিশ ভারতে মুসলমানদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে ভিতর থেকে নস্যাৎ করার জন্য উক্ত ভণ্ডনবীকে কাজে লাগানো হয়েছিল। এরা 'অমুসলিম' হিসাবে এদেশে বসবাস করুক, তাতে কারু কোন আপত্তি নেই। কিন্তু 'মুসলিম' হওয়ার দাবী নিয়ে মুসলিম সন্তানদের বিভ্রান্ত করবে, এটা কখনোই বরদাশত করা যায় না। কাদিয়ানীদের পক্ষে বিরোধী দলীয় নেত্রী ও বাম দল সমূহের সাফাই গাওয়ার বিরুদ্ধে তিনি তীব্র নিন্দা ও গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

রাজধানীতে ১ লাখ ২০ হাযার টোকাই

ঢাকা মহানগরীতে প্রায় ১ লাখ ২০ হাযার টোকাই আছে। এরা মহানগরীর অপচনশীল বর্জ্য (কাগজ, কাচ, কাঠ, প্লাস্টিক, টিন, লোহা প্রভৃতির তৈরী বর্জ্য) সংগ্রহ করে। দৈনিক এরা যে পরিমাণ বর্জ্য সংগ্রহ করে তা নগরীর প্রতিদিনের মোট বর্জ্যের প্রায় ১৫ শতাংশ। সিটি কর্পোরেশনকে যদি এই বর্জ্য অপসারণ করতে হ'ত, তাহ'লে প্রতি বছর আরো প্রায় ১০ কোটি টাকা বেশী ব্যয় হ'ত। গত ২০ ডিসেম্বর এফইজেবি আয়োজিত এক সেমিনারে বেসকারী সংস্থা 'ওয়্যাস্ট কনসার্নে'র সিনিয়র গবেষণা কর্মকর্তা আবূ আরীফ ইফতেখারুদ্দীন এই তথ্য প্রকাশ করেন।

[এই সালে বস্তিবাসী, ভবঘুরে ও ছিন্নমূলদের সংখ্যা যোগ করলে ঢাকা মহানগরীকে তিলোত্তমা করার স্বপ্ন পূরণ হবে কি? এরা দেশেরই সন্তান। এদের জন্য কিছু ভাববার ও করার মত কেউ আছে কি? (স.স)]

ব্যাংকে ভূমিকর খাজনা গ্রহণ শুরু

গত ১ জানুয়ারী থেকে ব্যাংকের মাধ্যমে ভূমিকর গ্রহণের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বৃটিশ শাসনামল থেকে প্রচলিত তহসিল অফিসের মাধ্যমে ভূমিকর প্রদানের বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বর্তমান সরকার এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের শাখায় এখন থেকে খাজনা দেওয়া যাবে। প্রাথমিকভাবে দেশের ৬টি বিভাগের ৬টি উপযেলার রাষ্ট্রায়ত্ত সোনালী, অগ্রণী, জনতা ও রূপালী ব্যাংকের শাখায় এই ভূমি কর গ্রহণ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০০৫ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে দেশের সকল উপযেলায় খাজনা প্রদানের ব্যাংকিং পদ্ধতি কার্যকর করা হবে।

১ বছরে বেসরকারী ব্যাংকগুলির মুনাফা বেড়েছে ২২.৪০ শতাংশ

দেশের বেসরকারী ব্যাংগুলি ২০০৩ সালে উচ্চহারে পরিচালনা মুনাফা করেছে। বিশেষ কয়েকটি ব্যাংক ছাড়া বাকী সব বেসরকারী ব্যাংকের মুনাফা বেড়েছে। এক বছরে সার্বিক মুনাফায় প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২২.৪০ শতাংশ। ৩০টি বেসরকারী ব্যাংকের মুনাফার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১ হাযার ৭৪০ কোটি টাকা। এর আগে কোন বছরই এত বিপুল মুনাফা বেসরকারী ব্যাংকগুলি করতে সক্ষম হয়নি। সংশ্লিষ্ট সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ৩০টি বেসরকারী ব্যাংকের মধ্যে সর্বাধিক ২১৬ কোটি টাকা পরিচালনা মুনাফা করেছে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ। এরপর উত্তরা ব্যাংক ১১৪ কোটি টাকা, প্রাইম ব্যাংক ১১০ কোটি টাকা, ন্যাশনাল ব্যাংক ১০২ কোটি টাকা এবং পূবালী ব্যাংক ১০০ কোটি টাকা। উল্লেখ্য যে, বেসরকারী ব্যাংকগুলি ২০০২ সালে মুনাফা করেছিল ১৪২২ কোটি টাকা। এবার মুনাফা করেছে ১৭৪০ কোটি টাকা। ১ বছরে ৩১৯ কোটি টাকা বা ২২.৪০ শতাংশ পরিচালনা মুনাফা বৃদ্ধি পেয়েছে।

[ব্যাংক লুটের সংখ্যা কত বেড়েছে এবং এযাবৎ কত টাকা লুট হয়েছে, তার হিসাবটাও জানা দরকার। সঙ্গে সঙ্গে 'তেলো মাথায় তেল দেওয়া'র বর্তমান পুঁজিবাদী ঋণদান নীতি পরিত্যাগ করে ঝুঁকিহীন সহজলভ্য ঋণদান পদ্ধতি চালু করার সুফারিশ রইল (স.স)]

আমেরিকা ও কানাডায় টেলিফোন কল করার নতুন পদ্ধতি

গ্রাহকবৃন্দের সুবিধার্থে 'বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড' আমেরিকা ও কানাডা দু'টি দেশে প্রতি মিনিট ৭.৫০ টাকা হারে সরাসরি আন্তর্জাতিক কল করা সুবিধা চালু করেছে। প্রাথমিক পর্যায়ে এ সুবিধা শুধুমাত্র ঢাকা মাল্টি এক্সচেঞ্জ এলাকার এনডব্লিউডি সুবিধাযুক্ত সকল টেলিফোনে প্রদান করা হয়েছে। এরপর একই রকম প্রযুক্তি ব্যবহার করে আভ্যন্তরীণ (এনডব্লিউডি) কলের খরচও কমানো হবে। গ্রাহকবৃন্দের অবগতির জন্য নীচে ডায়াল করার পদ্ধতি উল্লেখ করা হ'লঃ

হ্রাসকৃত হারে কল করার জন্য গ্রাহককে প্রথমে অ্যাকসেস কোড ০১২ ডায়াল করতে হবে। এরপর পর্যায়ক্রমে কান্ট্রি কোড (যা আমেরিকা ও কানাডার ক্ষেত্রে ১), এরিয়া কোড ও পরে টেলিফোন নম্বর ডায়াল করতে হবে।

মানবাধিকার সংগঠনগুলির রিপোর্ট

গত বছরে খুন ৩৮৩২ অপহরণ ৮৭১

'বাংলাদেশ মানবাধিকার ব্যুরো' (বিএইচআরবি) গত ৩১ ডিসেম্বর এক সাংবাদিক সম্মেলনে ২০০৩ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে বলেছে, গত বছর সারাদেশে বিভিন্ন অপরাধজনিত ঘটনায় ৩ হাযার ৮৩২ জন খুন ও ৪৪ হাযার ৯১১ জন আহত হয়েছে। খুনের এই সংখ্যা গত ২০০২ সালের চেয়ে ৪৭১ জন বেশী এবং আহতের সংখ্যা ১ হাযার ৩৯৫ জন বেশী। সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে ব্যুরোর মহাসচিব ও নির্বাহী পরিচালক এডভোকেট মুহাম্মাদ শাহজাহান বলেন, গত ২০০৩ সালের ১ জানুয়ারী থেকে গত ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সারাদেশে ৮৬৬ জন নারী ধর্ষণের শিকার, ৭১৩ টি নারী ও শিশু নির্যাতন, ৮৭১টি অপহরণ, ৩ হাযার ৭৮টি ডাকাতি, ১৯৫টি এসিড

নিক্ষেপের ঘটনা ও ১৬৯টি বোমা হামলা, ৩২৬টি গণপিটুনীর ঘটনায় ২০৪ জন নিহত ও ৩৪০ জন আহত, ৩৯৬ টি রহস্যজনক মৃত্যু, ৫৭ জন কারাহাজতির মৃত্যু, ৬৭২টি অপমৃত্যু, ৩৯০ টি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ৬৩ জন নিহত ও ৩৭৯ জন আহত হয়েছে। ৫৫৭ জন আত্মহত্যা, ১ হাযার ৩৩৫ টি হামলা-ভাঙচুর ও সন্ত্রাসের ঘটনা, ডাক্তারের অবহেলায় ৭২ রোগীর মৃত্যু, ১২৫ জন সাংবাদিক নির্যাতনের শিকার, সীমান্তে 'বিএসএফ'-এর হাতে ৪৬ জন নিহত ও সড়ক দুর্ঘটনায় ২ হাযার ৬২০ জনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে।

[হিসাব বহির্ভূতদের হিসাব যোগ করলে এর চেয়ে অনেক গুণ বেশী হবে। অতএব প্রশাসন তৎপর হৌন (স.স)]

মর্মান্তিক!

মাকে বেঁধে রেখে তার চোখের সামনে দুর্বৃত্তরা নির্মমভাবে জবাই করে হত্যা করেছে তার একমাত্র শিশুপুত্র জুলহাস (৯)-কে। কিশোরগঞ্জ যেলার নিকলী উপযেলার জারুইতলা ইউনিয়নের কামালপুর গ্রামে গত ৩ জানুয়ারী গভীর রাতে নৃশংস শিশুহত্যার এ ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ঐদিন রাত আড়াইটার দিকে ৫/৬ জনের একটি দুর্বৃত্ত দল উক্ত গ্রামের কৃষক ইদরীস আলীর বসত বাড়ীর দরজা ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করে তার স্ত্রী নূরেছা বানুকে বেঁধে রেখে তার একমাত্র পুত্র সন্তান ঘুমন্ত জুলহাসকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে নৃশংসভাবে জবাই করে হত্যা করে। এ সময় গৃহকর্তা ইদরীস আলী বাড়ীতে ছিল না। পুলিশের ধারণা, পূর্বশত্রুতার কারণে এ নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে।

দেওয়ানী মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে নতুন আইন

দেওয়ানী মামলায় দ্রুত বিচার নিষ্পত্তি করতে এবং মামলার সাথে সংশ্লিষ্টদের হয়রানি কমানোর লক্ষ্যে সরকার 'আদালত সংস্কার বাস্তবায়ন (সহায়ক বিধান) আইন-২০০৪' নামে একটি নতুন আইন করছে। আইনটি পরীক্ষামূলকভাবে আগামী দুই বছরের জন্য পাস করা হচ্ছে। ঢাকা, গাজীপুর, খুলনা, কুমিল্লা ও রংপুর যেলায় এবং সুপ্রীম কোর্টে সরকারের পাইলট প্রকল্পে প্রথমে এই আইনটি বাস্তবায়ন করা হবে। সেখানে আইনটির সুফল সন্তোষজনক হ'লে সারা দেশের আদালতে দেওয়ানী মালার ক্ষেত্রে আইনটি স্থায়ীরূপ দেওয়ার জন্য আরেকটি নতুন আইন পাস করা হবে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, মন্ত্রী পরিষদের বৈঠকে পেশ করার জন্য তৈরী খসড়ায় দেওয়ানী মামলা পৃথক পৃথক আদালতে পেশ না করে সকল মামলা এক জায়গায় পেশ করার বিধান রাখা হয়েছে। দেওয়ানী মামলার শ্রেণী বিন্যাস ও সমভাবে বন্টনের জন্য প্রতি যেলায় একজন ব্যবস্থাপক থাকবেন। মামলা দায়েরের পর থেকে সংশ্লিষ্ট মামলাটি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনীয় তদারকি করবে এই ব্যবস্থাপকের দফতর। এই আইনটি পাস হ'লে আদালতে দেওয়ানী মামলার রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য মান্ধাতা আমলের পদ্ধতির পরিবর্তে কম্পিউটার পদ্ধতি চালু করা হবে। প্রতি যেলার সকল মামলা একটি কম্পিউটার নেটওয়ার্কের আওতায় চলে আসবে।

[উদ্যোগটিকে আমরা স্বাগত জানাই। কিন্তু সম্প্রতি পাবলিক পরীক্ষাসমূহের ফল প্রকাশে কম্পিউটার যেসব ভুল তথ্যাদি পরিবেশন করেছিল, সেগুলির পুনরাবৃত্তি যেন মামলার ক্ষেত্রে না হয়, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলগণের সতর্ক দৃষ্টি কামনা করছি (স.স)]

বেনিনে বিমান দুর্ঘটনায় বাংলাদেশী ১৫ সেনা কর্মকর্তা নিহত

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বেনিনের রাজধানী ফটোনৌয়ে এক মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনায় সিয়েরালিওনে জাতিসংঘ মিশনে কর্মরত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ১২ জন অফিসার, একজন সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার এবং লাইবেরিয়ায় কর্মরত দু'জন অফিসার নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন একজন লেফটেন্যান্ট কর্ণেল, ৬ জন মেজর, ৭ জন ক্যাপ্টেন ও একজন সেমিও অর্থাৎ জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার। গত ২৫ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার বেনিন সময় বেলা ৩-টায় এবং বাংলাদেশ সময় রাত ৯-টায় এই হৃদয়বিদারক ঘটনাটি ঘটে। নিহত সেনা কর্মকর্তাগণ লেবাননের ইউনিয়ন ট্রান্সপোর্ট অফ্রিকান (ইউটিও) পরিচালিত একটি চার্টার করা বোয়িং-৭২৭ বিমানে করে ছুটিতে বাংলাদেশে আসছিলেন। মাত্র ছয় মাস পূর্বে তারা জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে কাজ করার জন্য দেশত্যাগ করেন। অতঃপর গত ৩১ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৭-টায় জাতিসংঘের বিশাল 'ইলিউশন-৭৬' পরিবহন বিমান বীর সেনানীদের লাশ নিয়ে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের টারমাকে এসে পৌঁছে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া লাশ গ্রহণ করেন। এ সময় মন্ত্রীবর্গ এবং চার বাহিনীর প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। ঐ দিনকে জাতীয় শোক দিবস ঘোষণা করা হয়। ১ জানুয়ারী সকাল ৮-টায় আর্মি স্টেডিয়ামে প্রথমে এবং সকাল ১০-টায় জাতীয় ঈদগাহ ময়দানে দ্বিতীয় ছালাতে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিন দুপুর ১-টায় বনানীর সেনা গোরস্থানে ৯ জনের লাশ পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় দাফন করা হয়। বাকী ৬ জনের লাশ তাদের পরিবারের ইচ্ছা অনুযায়ী নিয়ে যাওয়া হয় গ্রামের বাড়ীতে এবং সেখানেও জানাযা শেষে পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় লাশ দাফনের ব্যবস্থা করা হয।

উল্লেখ্য যে, নিহত অফিসারদের সকলেই বিবাহিত এবং তাদের মাঝে ক্যাপ্টেন পদবীর কয়েকজন কর্মকর্তা জাতিসংঘ মিশনে যাওয়ার পূর্বে বিয়ে করেন। জানা যায়, ১৫৬ জন যাত্রী ও ৭ জন ক্রু নিয়ে বিমানটি বিমানবন্দর ত্যাগ করে। বিমানটি ফটোনৌ বিমানবন্দর ত্যাগ করার সময় রানওয়ে থেকে ছিটকে পার্শ্ববর্তী একটি ভবনে আঘাত হানে। এতে বিমানটি বিস্ফোরিত হয়ে আগুন ধরে যায় এবং ছুটে গিয়ে নিকটবর্তী আটলান্টিক মহাসাগরে পতিত হয়। ফলে ১২৮ জন যাত্রী নিহত হন। এর শতকরা ৯৯ ভাগই লেবাননের নাগরিক। দুর্ঘটনার কারণ হিসাবে বেনিনের সরকারী সূত্র জানায়, অতিরিক্ত যাত্রী নেয়া ও ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার কারণেই সম্ভবতঃ দুর্ঘটনাটি ঘটে।

[এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় আমরা গভীরভাবে মর্মাহত। আমরা তাদের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং দেশকে তাদের বিপরীতে উত্তম সেনা কর্মকর্তা দান করার জন্য আল্লাহর নিকটে প্রার্থনা করছি (স.স)]

বাংলাদেশে কাদিয়ানীদের সকল প্রকাশনা বিক্রয় বিতরণ ও সংরক্ষণ নিষিদ্ধ ঘোষণা

বাংলাদেশে কাদিয়ানীদের সকল প্রকাশনা, বিক্রয়, বিতরণ ও সংরক্ষণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে সরকার। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুভূতিতে আঘাত হানার দায়ে কাদিয়ানী সংগঠন 'আহমাদীয়া মুসলিম জামাত' কর্তৃক বাংলা এবং অন্য যেকোন ভাষায় প্রকাশিত 'কুরআন মাজীদ-এর বাংলা অনুবাদ সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ ও সকল পুস্তক এবং বুকলেট প্রভৃতি

বিক্রয়, প্রকাশনা, বিতরণ ও সংরক্ষণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে বলে গত ৮ জানুয়ারী রাতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়। ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মুশাররফ হুসাইন শাহজাহানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উল্লেখ্য, কাদিয়ানীদেরকে সরকারীভাবে অমুসলিম ঘোষণা ও তাদের সকল প্রকাশনা ও প্রচার নিষিদ্ধ করার দাবী দীর্ঘদিনের। ইতিপূর্বের সরকার কোন রকমের সিদ্ধান্ত না নেয়ায় বর্তমান সরকার এই উদ্যোগের জন্য প্রশংসার দাবী রাখে।

[আমরা সরকারের এই পদক্ষেপের প্রশংসা করছি এবং আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। সাথে সাথে অনতি বিলম্বে কাদিয়ানীদের 'অমুসলিম' ঘোষণার দাবী জানাচ্ছি (স.স)]

জাটকা নিধনঃ বছরে ২৬ হাযার কোটি টাকার ইলিশ ধ্বংস

পদ্মা-মেঘনায় প্রতি বছর জাটকা নিধনের মাধ্যমে প্রায় ২৬ হাযার কোটি টাকা মূল্যমানের ইলিশ সম্পদ ধ্বংস করা হচ্ছে। এভাবে জাটকা নিধনের ফলে ইলিশের অস্তিত্ব হুমকির মুখে দাঁড়িয়েছে। এসব ধৃত জাটকার শতকরা ১৫ ভাগও সংরক্ষণ করা সম্ভব হ'লে বর্তমান উৎপাদনের অতিরিক্ত আরো দেড় থেকে ২ লাখ টন বেশী ইলিশ উৎপাদন করা সম্ভব হ'ত। যার অতিরিক্ত মূল্য হ'ত ২ হাযার কোটি টাকা। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের ১৪ ভাগই আসছে ইলিশ আহরণের মাধ্যমে। ইলিশকে সর্বাধিক উৎপাদিত প্রজাতি বলা হয়। বিশ্বে প্রতিবছর যে পরিমাণ ইলিশ আহরিত হয়, তার শতকরা ৭৫ ভাগ ধরা পড়ে বাংলাদেশে। বাকী ২০ ভাগের ১৫ ভাগ ভারত ও মায়ানমারে এবং অন্য ৫ ভাগ বিশ্বের অন্যান্য স্থানে আহরিত হয়। বাংলাদেশের জিডিপিতে প্রতিবছর ৪ দশমিক ৭ ভাগ এবং বৈদেশিক মুদ্রার ৯ থেকে ১২ ভাগ ইলিশের আয় থেকে এসে যুক্ত হয়। দেশের মোট জনসংখ্যার দু'ভাগেরও বেশী লোক জীবিকার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ইলিশের উপর নির্ভরশীল।

মৎস্য বিজ্ঞানীদের গবেষণা থেকে জানা যায়, ইলিশ একটি প্রচারণশীল (MIGRATORY) মাছ। দক্ষিণ চীন অঞ্চল থেকে মায়ানমার, বাংলাদেশ, ভারত পাকিস্তান ও পশ্চিমে আরব উপসাগরীয় অঞ্চল পর্যন্ত এদের বিস্তৃতি। এতদঞ্চলে প্রাপ্ত ৫টি প্রজাতির মধ্যে TENALOSE ILISHA নামে পরিচিত প্রজাতির ইলিশ মায়ানমার, বাংলাদেশ ও ভারতে সবচেয়ে সহজলভ্য। চন্দনা ইলিশ বাংলাদেশের উপকূল ও সাগর এলাকায় কিছু কিছু পাওয়া যায়। তবে বাংলাদেশের মোহনা, উপকূলের আধা লবণাক্ত পানিও সুস্বাদু পানিসহ ভারত মহাসাগর এলাকায় ইলিশের রিভারসেডের অবাধ চলাচল ও বিস্তৃতি ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায়। প্রজনন মৌসুমে পরিপক্কতা প্রাপ্ত হ'লে ইলিশ মাছ ডিম ছাড়ার জন্য মোহনা বা নদীতে চলে আসে। ঝাঁকে-ঝাঁকে প্রাপ্ত বয়স্ক ইলিশ সাগর থেকে উজানের স্রোত ধরে মোহনা বা নদীতে অপেক্ষাকৃত কম লবণাক্ত পানিতে এসে ডিম ছাড়ে। প্রজনন শেষে পুনরায় সমুদ্রে ফিরে যায়। এখানেই ডিম থেকে পোনা বের হয় এবং পরবর্তীতে এসব পোনা আরো উজানের মিঠা পানির অঞ্চলে তাদের উপযুক্ত বিচরণ ও নার্সারী ক্ষেত্র খুঁজে নেয়। নার্সারী ক্ষেত্রে এরা চাপিলা মাছের মত আকৃতিতে পৌঁছালে জাটকা নামে পরিচিতি হয়। এই জাটকাই ক্রমান্বয়ে বড় হয়ে লোনা পানি সহ্য করার ক্ষমতা অর্জন করে ও উপকূলের দিকে ধাবিত হয়। এদের তরুণকাল উপকূলের লোনা পানিতে অতিক্রান্ত হয়। তরুণ ইলিশ পরে সাগরে যায় এবং সেখানে প্রজনন পরিপূর্ণতা লাভ করে। এক হ'তে দু'বছর বয়সে ইলিশ মাছ প্রজননক্ষম হয়।

বাংলাদেশের ইলিশের মোট ৫টি প্রজনন ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলি হচ্ছে- হাতিয়ার মৌলভীর চর, পূর্ব হাতিয়ার লইট্যার চর, সন্দ্বীপের কালিচর, ভোলার মনপুরা ও ঢলচল ইত্যাদি। প্রায় সারা বছরই ইলিশ ডিম ছাড়লেও সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসেই মূলত ইলিশের প্রজনন মৌসুম। একটি পূর্ণাঙ্গ ইলিশ আকার ভেদে ১০ লাখ থেকে ২০ লাখ পর্যন্ত ডিম দেয়। জাটকা ইলিশের বৃহৎ বিচরণ ক্ষেত্র দু'টি। প্রথমটি চাঁদপুর যেলার মতলব উত্তর উপযেলার ষাটনল থেকে হাইমচর উপযেলার নীলকমল হয়ে পার্শ্ববর্তী লক্ষ্মীপুর যেলার হাজিমারা পর্যন্ত বিস্তৃত। অপরটি পটুয়াখালীর কুয়াকাটা থেকে খুলনায় দুবলাচর পর্যন্ত বিস্তৃত। জানুয়ারী থেকে মে মাস পর্যন্ত এ দু'টি এলাকায় জাটকা পাওয়া যায়। তবে মার্চ-এপ্রিল মাসেই জাটকা ধরার প্রধান মৌসুম। চাঁদপুর মাৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষণার ফলাফল থেকে জানা যায়, ১৯৯০ থেকে '৯৯ সাল পর্যন্ত উল্লিখিত এলাকাগুলিতে জগৎবেড় ও বেহুন্দী জালের সাহায্যে প্রতিবছর সাড়ে ৩ হাযার থেকে ৬ হাযার টন জাটকা ধরা হয়েছে। এসব জাটকা ধরা না হ'লে বছরে অতিরিক্ত প্রায় ৬০ হাযার টন ইলিশ উৎপাদিত হ'ত।

গবেষণায় আরো দেখা গেছে, ইলিশের স্বাভাবিক আকৃতি ১৯৯২ সালের দিকে যা ছিল তা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। ১৯৯২ সালের প্রথমে ধরার আকৃতি ছিল ৩৫ সেন্টিমিটার। কিন্তু ২০০০ সালে তা নেমে ১৩.১২ সেন্টিমিটারে এসে দাঁড়িয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে জাটকা ও কিশোর ইলিশ ধরায় বড় আকৃতির ইলিশের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য বিজ্ঞানীরা বলছেন, ইলিশের আহরণমাত্রা নিয়ন্ত্রণ অত্যাবশ্যক। ইলিশ মাছের অবাধ প্রজননের জন্য অক্টোবর মাসের ভরা পূর্ণিমার প্রথম ৭ দিন ইলিশ মাছ ধরা বন্ধ রাখা, জাটকা নিধন রোধের জন্য কারেন্ট জালের পাশাপাশি জগৎবেড়, বেহুন্দি জাল ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা ও কার্যকর করা, জাটকা নিধন রোধের জন্য মৎস্য সংরক্ষণ আইন আরো কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা, আইনের সংশোধন করে সাজার পরিমাণ বাড়নো, মেঘনা নদীর ষাটনল হ'তে নীলকমল পর্যন্ত অংশ জাটকার অভয়াশ্রম হিসাবে ঘোষণা করে ফেব্রুয়ারী হ'তে এপ্রিল মাস পর্যন্ত সেখানে মাছ ধরা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা, কারেন্ট জালের ক্ষেত্রে ১০ সেঃমিঃ এবং অন্যান্য জালের ক্ষেত্রে ৯ সেঃমিঃ-এর কম ফাঁসের জাল ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা ইত্যাদি প্রয়োজন। পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের নদ-নদীতে গাঁড়া জাল দিয়ে ইলিশ মাছ ধরা বন্ধ ঘোষণা করতে হবে।

চট্টগ্রামে 'এশিয়ান উইমেন ইউনিভার্সিটি'

বাংলাদেশে প্রথমবারের মত আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন এবং মহিলাদের জন্য বিশেষায়িত একটি বিশ্ববিদ্যালয় নির্মিত হচ্ছে চট্টগ্রামে। 'এশিয়ান উইমেন ইউনিভার্সিটি' নামের এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পে ব্যয় করা হচ্ছে ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায় ৬ হাযার কোটি টাকা)। তবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মাত্র ২৫ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে বাংলাদেশী ছাত্রীদের জন্য। বাকী ৭৫ শতাংশ ছাত্রী আসবে এশিয়ার অন্যান্য দেশ থেকে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গত ১৩ জানুয়ারী দুপুরে চট্টগ্রামে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

সীতাকুণ্ড থানা আর নগরীর পাহাড়তলী থানার সীমান্তবর্তী পাহাড়ী এলাকায় ১০৫ একর এলাকার উপর এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে পাশ্চাত্যের আদলে গড়ে তোলা হবে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্যাটেলাইট শহর। এতে ক্যাম্পাসের পাশাপাশি ডরমেটরি, অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি, সুইমিংপুল, বাজারসহ সবকিছুই থাকবে। আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের নকশা, নির্মাণসজ্জা সবকিছুই করা হবে বিদেশী কোম্পানীর মাধ্যমে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিজাইন ও নির্মাণ কাজ তদারকির জন্য আমেরিকার খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান 'এমআইটি' ও রোড আইল্যান্ড স্কুল অব ডিজাইনের ১০ সদস্যের একটি বিশেষজ্ঞ স্থপতি ও প্রকৌশলী দল গত ১০ জানুয়ারী চট্টগ্রামে এসেছেন।

[বিদেশী বেহায়া সংস্কৃতির মেয়েরা এসে যেন এদেশী মেয়েদেরকেও বেলেল্লা করে না ফেলে, সেজন্য সকল ছাত্রীর জন্য বোরক্বা-স্কার্ফ পরিধান বাধ্যতামূলক করুন ও একক ইউনিফরম চালু করুন (স.স)]

রাজস্ব সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন

২ লক্ষ কোটি টাকার বিদেশী সাহায্যের অধিকাংশ কালো টাকায় পরিণত

স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশ যে ২ লক্ষ কোটি টাকা বিদেশী সাহায্য ও ঋণ হিসাবে পেয়েছে, তার একটি বড় অংশ দুর্নীতির মাধ্যমে কালো টাকায় পরিণত হয়েছে। একই সাথে ব্যাংকিং খাতের ৩০ হাযার কোটি টাকার খেলাপী ঋণের একটি উল্লেখযোগ্য অংশও কালো টাকার প্রবাহে মিশে গেছে। ঘুষ, দুর্নীতি, চোরাচালান ও কর ফাঁকি দানের মাধ্যমে সৃষ্ট কালো টাকা সৎ লোকদের উপর বোঝা বাড়াচ্ছে, দেশের অর্থনৈতিক শৃংখলা ভেঙ্গে দিচ্ছে, রাজস্বহানি ঘটিয়ে উন্নয়ন কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করছে, সর্বোপরি জাতীয় নিরাপত্তা এবং দেশের আইন-শৃংখলাকে মারাত্মক হুকমির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। অতিসম্প্রতি রাজস্ব সংস্কার কমিশনের দেয়া চূড়ান্ত প্রতিবেদনের কালো টাকা ও রাজস্ব ফাঁকি সংক্রান্ত অধ্যায়ে একথা বলা হয়। অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম সাইফুর রহমানের কাছে প্রায় ৭০০ পৃষ্ঠার এই বিশাল প্রতিবেদনটি হস্তান্তর করা হয়। ১ বছরব্যাপী কাজ করে কমিশন সদস্যরা রাজস্ব সংস্কারের ব্যাপারে মন্তব্য ও সুপারিশ সম্বলিত এ প্রতিবেদনটি তৈরী করে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, কালো অর্থনীতির সম্ভাব্য কারণের মধ্যে রয়েছে অযৌক্তিক কর কাঠামো, কর শুল্ক আইনের অনাহূত জটিলতা, অদক্ষতা, দুর্নীতি, কর কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের অভাবে সৃষ্ট অদক্ষতা এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক কাঠামো, স্বজনপ্রীতি ও সৎভাবে ব্যবসা করার উচ্চ মূল্য। কমিশন কালো টাকা নিয়ন্ত্রণের জন্য কয়েকটি সুপারিশ করেছে। কমিশনের মতে, যাদের কর আদায় সন্তোষজনক হবে, তাদের পুরস্কৃত করতে হবে। কর আদায় এবং পুরস্কৃত করার জন্য একটি প্রক্রিয়া বের করে তাদের 'পারফর্মেন্স বোনাস' দিতে হবে। একই সাথে কর কাঠোমোর বাইরে থাকা আয়কে করের আওতায় আনার পদক্ষেপ নিতে হবে। সেই সাথে উৎপাদন খাতে কর অনারোপিত অর্থ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে রেয়াত প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে।

[ঈমানদীপ্ত মানুষ ব্যতীত অন্যদের হাতে অর্থ গেলে তা কালো টাকায় পরিণত হওয়াটাই স্বাভাবিক। অতএব দেশে ঈমানদার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করুন (স.স)]

বিদেশ

০ দ্বাদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত

সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা আর বর্ণাঢ্য আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে গত ৪ জানুয়ারী রবিবার পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে শুরু হয় সাত জাতির দ্বাদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলন। সম্মেলন শুরু হয় সে দেশের সময় সকাল ১০-টায়। তিন দিনব্যাপী শীর্ষ সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মীর জাফরুল্লাহ খান জামালী। তার পূর্বে সার্কের সাবেক চেয়ারপার্সন নেপালের প্রধানমন্ত্রী দ্বাদশ শীর্ষ সম্মেলনের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। অতঃপর স্বাগতিক দেশের চেয়ারপার্সন মনোনীত করে তার কাছে সম্মেলনের সভাপতিত্বের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়।

দীর্ঘ তিন দিন পর ৬ জানুয়ারী মঙ্গলবার সন্ত্রাস নির্মূল, দারিদ্র্য বিমোচনসহ দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় দেড়শ' কোটি মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার অঙ্গীকার সম্বলিত ৪৩ দফা ইসলামাবাদ ঘোষণার মধ্য দিয়ে সার্ক শীর্ষ সম্মেলন সমাপ্ত হয়। সদস্য দেশগুলির মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, বাণিজ্য বৈষম্য দূরীকরণ এবং বিদ্যমান শুল্ক ও অশুল্ক বাধা অপসারণের লক্ষ্যে বহুল আলোচিত 'সাউথ এশিয়ান ফ্রি ট্রেড এরিয়া' (সাফটা) ফ্রেমওয়ার্ক স্বাক্ষরিত হয় সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে। সাফটা চুক্তি কার্যকর হবে ২০০৬ সালের জানুয়ারী থেকে। সার্কের ইতিহাসে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবারের সম্মেলনে। সম্মেলনে ৭ জাতির নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী, শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা, নেপালের প্রধানমন্ত্রী সূর্য বাহাদুর থাপা, ভুটানের প্রধানমন্ত্রী জিগমে থিনলে এবং মালদ্বীপের মামুন আব্দুল গাইয়ুম।

উত্তর কোরিয়া শর্তসাপেক্ষে যাবতীয় পরমাণু কার্যক্রম বন্ধ করবে

পারমাণবিক কর্মসূচী বাতিল প্রশ্নে অবশেষে চমক দেখাল উত্তর কোরিয়াও। গত ৬ জানুয়ারী স্টালিনপন্থী কমিউনিষ্ট ভাবাদর্শী উত্তর কোরিয়া প্রস্তাব করেছে যে, তারা তাদের যাবতীয় পারমাণবিক কর্মকাণ্ড বন্ধ করবে এই শর্তে যে, এর বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্র দেশগুলি পিয়ংইয়ংকে প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলিতে ছাড় দিবে। এ প্রস্তাবের আওতায় এমনকি পারমাণবিক জ্বালানি উৎপাদনের কর্মকাণ্ডও বন্ধ রাখা হবে। এর বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্রকেও অনুরূপ ছাড় দেওয়ার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে বলে প্রস্তাবে বলা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে, দুঃসাহসিক এই ছাড়ের বিনিময়ে ওয়াশিংটনের 'সন্ত্রাসী তালিকা' থেকে উত্তর কোরিয়ার নাম বাদ দিতে হবে এবং আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে জ্বালানি সাহায্য পুনরায় শুরু করা সহ অন্যান্য সহায়তাও চালু করতে হবে।

দখলদার মার্কিন সৈন্যদের জন্য বিশেষ বোনাস

গেরিলা হামলার তীব্রতা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্র ইরাকে মোতায়েন মার্কিন সৈন্যদের বিশেষ বোনাস দিয়ে উৎসাহিত করার পরিকল্পনা নিয়েছে। এতে শুধু ইরাক নয় আফগানিস্তানে

মোতায়েন কয়েক হাযার সেনাকেও ৫ হাযার থেকে ১০ হাযার ডলার পর্যন্ত বোনাস দেওয়া হবে এই শর্তে যে, তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই দেশগুলিতে অবস্থান করবে। এ বোনাস প্রদানের জন্য ২০০৪ সালের মার্কিন প্রতিরক্ষা বাজেটে ৬ কোটি ৩০ লাখ ডলার বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এই বোনাস চালু হওয়ার পর রণক্ষেত্র ত্যাগ করা কিংবা চাকরি থেকে অবসর নেয়ার প্রশ্নে সামরিক নিষেধাজ্ঞা আরোপিত থাকবে। উল্লেখ্য, ১৯৯১ সালের প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় এ ধরনের বোনাস প্রথম চালু করা হয়।

ইসরাঈল ও তুরস্কের মধ্যে পানি চুক্তি

তুরস্ক অস্ত্রের বদলে ইসরাঈলকে পানি দিতে সম্মত হয়েছে। এর ফলে তুরস্ক থেকে বড় বড় ট্যাংকারে করে মিঠা পানি পূর্বাঞ্চলীয় ভূমধ্যসাগর দিয়ে ইসরাঈলী বন্দরে যাবে। গত ৪ জানুয়ারী বৃটিশ সংবাদপত্র একথা জানায়। ইসরাঈলী প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শ্যারণ ও তুরস্কের জ্বালানিমন্ত্রী জেকি ক্যাকান গত ৫ জানুয়ারী জেরুযালেমে এক বৈঠকে এই ঐতিহাসিক চুক্তিতে পৌঁছান। এই চুক্তির আওতায় ইসরাঈল আনাতোলিয়ার মানাভগাত নদী থেকে ৫ কোটি কিউবিক মিটার পানি আনার জন্য বড় বড় পানি ট্যাংকার নির্মাণ করবে। এর বদলে ইসরাঈল তুরস্কের কাছে অসংখ্য ট্যাংক ও বিমানবাহিনীর প্রযুক্তি বিক্রি করবে।

[অস্ত্র না নিয়ে এই দুশমনকে পানিতে মারাই উত্তম ছিল (স.স)]

মাইকেল জ্যাকসনের ইসলাম গ্রহণ

পপ সঙ্গীতের জীবন্ত কিংবদন্তী মাইকেল জ্যাকসন পবিত্র ইসলাম ধর্মের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছেন। গত ১৭ ডিসেম্বর বুধবার তিনি খ্রীষ্ট ধর্ম পরিত্যাগ করে সাম্য ও মানবতার ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করেন। মাইকেল জ্যাকসন এমন এক দুর্যোগপূর্ণ সময়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন, যখন তার মাতৃভূমি যুক্তরাষ্ট্রে মুসলমানদের সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে কারাগারে নিক্ষেপ করা হচ্ছে এবং ইসলামের অগ্রযাত্রা রোধে গভীর চক্রান্ত চলছে।

উল্লেখ্য যে, মাইকেলের সুখ্যাতি ও যশ ধ্বংস করার জন্য তার বিরুদ্ধে একটির পর একটি মামলা দায়ের করা হয় বলে খবরে প্রকাশ। শ্বেতাঙ্গ খ্রীষ্টানরা তার বিরুদ্ধে মাদক সেবনের অভিযোগ করে। তিনি মাদকের নেশায় উন্মাতাল হয়ে নেচে গেয়ে দশর্কদের মন জয় করেন। এ সমস্ত ষড়যন্ত্রের কথা আগাম বুঝতে পেরে মামলা দায়ের করার পূর্বেই তিনি ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, ১৯৮৯ সালে তার বড় ভাই জারমেইল জ্যাকসন ইসলাম গ্রহণ করেন। মাইকেল জ্যাকসনের ইসলাম গ্রহণে তার ভাইয়ের অবদানই সবচেয়ে বেশী।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিদিন ৫ হাযার বিমানযাত্রীর লাগেজ হারায়

যুক্তরাষ্ট্রে দৈনিক গড়ে ১০ লাখ লোক বিমানে চড়ে। এর মধ্যে গড়ে ৪৮০০ জন লাগেজ হারানোর অভিযোগ করেন। যুক্তরাষ্ট্রে দৈনিক ১৪৬০০ বাণিজ্যিক বিমান চলাচল করে আভ্যন্তরীণ রুটে। এ ছাড়া বিমান ও হেলিকপ্টার উড়ে দৈনিক গড়ে ১ লক্ষ ৩২ হাযার বার। এয়ার ট্রান্সপোর্ট এসোসিয়েশনের সূত্রে এ খবর জানানো হয়।

গত বছরে বিশ্বে ৯১ সাংবাদিক নিহত

গত বছর ছিল সাংবাদিকদের মৃত্যুর বছর। গত বছর ৯১ জন সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। ইরাক যুদ্ধের কারণে সাংবাদিকদের নিহত হওয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। গত ৯ জানুয়ারী সিডনিতে ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব জার্নালিষ্টের (আইএফজে) এক বিবৃতিতে একথা বলা হয়। বিবৃতিতে ফেডারেশন জানিয়েছে পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে গত বছর হতাহতের সংখ্যা ছিল ২৩ শতাংশ বেশী এবং ২৫ টিরও বেশী দেশে সাংবাদিকরা হতাহত হন।

ফেডারেশন সভাপতি ক্রিস্টোফার ওয়ারেন বলেন, ২০০৩ সালে যুদ্ধ ও সংঘাতের প্রতিক্রিয়া সাংবাদিকতার উপর দীর্ঘ কালো ছায়া ফেলে। তিনি বলেন, ইরাক যুদ্ধ, কলম্বিয়ায় সংঘর্ষ এবং ফিলিপাইনে সহিংসতায় এ বছর সাংবাদিক নিহত হওয়ায় প্রচার মাধ্যমে ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছে। উল্লেখ্য, ইরাক যুদ্ধেই ১৮ জন সাংবাদিক নিহত হয়েছে।

ওয়াশিংটনে ম্যাডকাউ রোগ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ম্যাডকাউ রোগ ধরা পড়াতে জাপানসহ ২৪টির বেশী দেশ মার্কিন গরুর গোশত কেনা বন্ধ করে দিয়েছে। জাপান মার্কিন গরুর গোশতের প্রধান গ্রাহক বলে জাপানের উদ্বেগ দূর করতে মার্কিন কৃষি কর্মকর্তারা গত ২৯ ডিসেম্বর টোকিওতে ভিড় জমান। ওয়াশিংটনে গত সপ্তাহে এই রোগ ধরা পড়ার পরপরই ঐ দেশগুলি গরুর গোশত কেনা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিয়েছে।

বিশ্বজুড়ে 'বার্ড ফ্লু' মহামারীর আশঙ্কা ভিয়েতনামে ১৩ জনের মৃত্যু

জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও ভিয়েতনামে সম্প্রতি 'বার্ড ফ্লু' মহামারি আকারে দেখা দিয়েছে। ভিয়েতনামে বার্ড ফ্লু-তে আক্রান্ত হয়ে ১৩ জন নিহত হয়েছে। এদের মধ্যে ১০টি শিশু এবং ৩ জন বয়স্ক লোক। ভিয়েতনাম সরকার জানায় এই 'বার্ড ফ্লু' বিশ্বজুড়ে মহামারী আকারে ছরিয়ে পড়তে পারে। ভিয়েতনাম বার্তা সংস্থা জানায়, দেশটিতে ১৮জন লোকের দেহে 'ইনফ্লুয়েঞ্জা এ' ভাইরাস ধরা পড়েছে। এদের মধ্যে ১৩ জনই মারা গেছে।

উল্লেখ্য যে, রোগাক্রান্ত হাঁস-মুরগী ও পাখির বিষ্ঠা থেকে 'ইনফ্লুয়েঞ্জা এ' ভাইরাস মানবদেহে ছড়ায়। চিকিৎসা বিজ্ঞানে এ ভাইরাস 'এইচ ফিফটি ওয়ান এল' ভাইরাস নামে পরিচিত। এর সংক্রমণে মানবদেহে যে রোগ হয় তাকে বলা হয় 'বার্ড ফ্লু'। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, মানবদেহে এই ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস সার্স ভাইরাসের চেয়েও ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে।

এদিকে 'বার্ড ফ্লু' আতঙ্কে ইন্দোনেশিয়া তার প্রতিবেশী দেশ থেকে মুরগী আমদানি বন্ধ করে দিয়েছে। চীন ভিয়েতনাম, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া থেকে মুরগী এবং মুরগীর গোশত, ডিম ও পালক আমদানী নিষিদ্ধ করেছে। অপরদিকে ভিয়েতনামের দক্ষিণাঞ্চলীয় ১৮টি প্রদেশে মুরগীর চালানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

মুসলিম জাহান

ইরানে ভয়াবহ ভূমিকম্প

ইরানের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় কেরমান প্রদেশের ঐতিহাসিক বাম নগরী প্রচণ্ড ভূমিকম্পে তছনছ হয়ে গেছে। গত ২৬ ডিসেম্বর শুক্রবার স্থানীয় সময় ৫-টা ৩০ মিনিটে ভয়াবহ ভূমিকম্প আঘাত হানলে প্রায় ৫০ হাযার লোক প্রাণ হারায়। এতে নগরীর ৭০ শতাংশ ঘরবাড়ী বিধ্বস্ত হয়েছে। ভূমিকম্পের মাত্রা স্থানীয়ভাবে রিক্টার স্কেলে ৬ দশমিক ৩ বলা হ'লেও মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ দফতর এই মাত্রা ৬ দশমিক ৭ বলে জানিয়েছে। প্রেসিডেন্ট খাতামী এ জন্য আন্তর্জাতিক সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন। রাষ্ট্রায়ত্ত প্রচারমাধ্যমে বলা হয়, ভূমিকম্পে বামের দু'টি হাসপাতাল ধ্বংস হয়েছে এবং এর অনেক স্টাফ মারা গেছে। ৫টি হেলিকপ্টার ও ২টি পরিবহন বিমানে করে হতাহতদের পার্শ্ববর্তী শহরে সরিয়ে নেয়া হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে, শিশুদের কান্নার রোল এবং স্বজন হারাদের আহাজারিতে সেখানকার আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে যায়।

উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে ১৯৯০ সালে ইরানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এক ভয়াবহ ভূমিকম্প আঘাত হানে। এতেও প্রায় ৫০ হাযার লোক নিহত হয়। রিক্টার স্কেলে-এর মাত্র ছিল ৭.৩। এছাড়া ১৯৭৮ সালে ইরানের উত্তর-পূর্বাঞ্চলেও অপর ভয়াবহ ভূমিকম্পে ২৫ হাযার লোক নিহত হয়। এর মাত্রা ছিল ৭.৭।

'ইরানে ভূমিকম্প রিপোর্টের শেষ দিন!

ভূমিকম্পের ১৩ দিন পর জীবিত উদ্ধার

ভূমিকম্পের দীর্ঘ ১৩ দিন পর গত ৭ জানুয়ারী একটি উদ্ধারকারী দল ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে আব্দুল জলীল নামের এক ব্যক্তিকে জীবিত উদ্ধার করেছে। লোকটি একটি ওয়াড্রোবের নীচে চাপা পড়েছিল। এ ওয়াড্রোবে একটু ফাঁকা থাকায় তার শ্বাস-প্রশ্বাসে অসুবিধা হয়নি। এটাকে একটি অলৌকিক ঘটনা হিসাবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, ভূমিকম্পের ধ্বংসাবশেষের ভেতর খাদ্য ও পানীয় ছাড়া ৩ দিনের বেশী কারো জীবিত থাকার কথা নয়। কিন্তু মানুষের ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণ করে ৫৬ বছরের আব্দুল জলীল ১৩ দিন পরও জীবিত রয়েছেন।

নজীব রাজাক মালয়েশিয়ার উপ-প্রধানমন্ত্রী

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আব্দুল্লাহ আহমাদ বাদাবী গত ৭ জানুয়ারী মন্ত্রীসভার রদবদল এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী নজীব রাজাককে তার ডেপুটি হিসাবে নিয়োগ করেন। মালয়েশিয়া পত্রিকাগুলি বলেছে, নজীব রাজাক প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বেই থাকছেন। উল্লেখ্য, নজীবের পিতা রাজাক হুসাইন মালয়েশিয়ার দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এবং তার চাচা ছিলেন তৃতীয় প্রধানমন্ত্রী। পিতার মৃত্যুর পর ১৯৭৬ সালে ২২ বছর বয়সে নজীব পার্লামেন্ট সদস্য হন।

আতংকিত মার্কিন সৈন্যদের উক্তি

মাসে ১০ লাখ ডলার বেতন দিলেও ইরাকে আর থাকছি না

ইরাকে মোতায়েন বর্তমান সৈন্যদের স্থলে নতুন সৈন্য মোতায়েনের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। তবে বর্তমান সৈন্যদের ইরাকে আরেক মেয়াদ অবস্থানে উৎসাহদানে প্রত্যেককে মাসে ১০ হাযার ডলার করে বেতন দেওয়ার অঙ্গীকার করেছে। কিন্তু মোতায়েনকৃত সৈন্যরা ইরাকে থাকতে চাইছে না। গেরিলা হামলায় নিহত হওয়ার আশংকায় তারা ঘরে ফিরতে চাইছে। তারা কেউ কেউ বলছে, মাসে ১০ লাখ ডলার বেতন দেওয়া হ'লেও তারা ইরাকে আর এক মুহূর্তও থাকতে রাযী নয়। তিকরিতে মোতায়েন মার্কিন চতুর্থ পদাতিক ডিভিশনের কর্পোরাল উইল ট্যাট বলেছে, সে ১০ লাখ ডলার বেতনেও ইরাকে থাকবে না। বাকুলায় একটি চেকপয়েন্ট প্রহরায় নিয়োজিত ২৩ বছরের একজন স্পেশালিষ্ট বলেছে, যত বেতনই দেয়া হৌক আমি এখানে থাকব না।

গিনেস বুকে ১৩১ বছর বয়সী এক সঊদী মহিলা

সঊদী আরবের নামশাহ আল-নাজিহ (১৩১) বিশ্বের সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলা হিসাবে গিনেস বুক অব রেকর্ডে নাম লিখিয়েছেন। স্থানীয় প্রচার মাধ্যম ১৯ ডিসেম্বর এ তথ্য জানায়। সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী এই মহিলা আসিরের গ্রীন প্রদেশে এক মাটির বাড়িতে বাস করেন। তিনি সারা জীবন কৃষি এবং মেষ পালনের কাজ করেছেন। বর্তমানে নড়াচড়া করেন তার দুই ঘনিষ্ট আত্মীয়ের সহযোগিতায়। তার এক নাতি বলেন, তার দাদীকে জীবনে মাত্র একবার হাসপাতালে যেতে দেখেছেন। ২০ বছর অন্ধ থাকার পর নামশাহ তার চোখে অস্ত্রোপচার করেন। গিনেস বুক অব রেকর্ডে নাম অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে নামশাহর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ১১৬ বছর বয়সী জাপানের এক মহিলা।

কুর্দিদের স্বায়ত্তশাসন দিয়ে ইরাক ভাঙ্গার ষড়যন্ত্র

ইরাক খণ্ড-বিখণ্ড করার ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে দখলদার বাহিনী বিচ্ছিন্নতাবাদী কুর্দিদের স্বায়ত্তশাসন প্রদানের তোড়জোড় শুরু করায় এ অঞ্চলের দেশগুলির আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার প্রতি মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি হয়েছে। দখলদার শক্তি কোনরূপ রাখঢাক না করে ইরাকে লুটপাট চালিয়ে যাচ্ছে। দখলদার শক্তির অনুকূল্য ও ছত্রছায়ায় বিচ্ছিন্নতাবাদী কুর্দিরা ইরাক ভেঙ্গে দেশের উত্তরাঞ্চলে নিজেদের জন্য একটি আলাদা রাষ্ট্র কায়েমে তৎপর হয়ে উঠেছে। কৌশলগত কারণে আপাতত তারা স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েমের কথা বলছে না। তারা ফেডারেল ব্যবস্থার আওতায় স্বায়ত্তশাসন চাচ্ছে। তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে, এক গণভোটের মাধ্যমে ইরাক থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া। এজন্য তারা দখলদার নিয়োজিত গভর্নিং কাউন্সিলকে কুর্দি এলাকায় গণভোট অনুষ্ঠানে চাপ দিচ্ছে। এদিকে গভর্নিং কাউন্সিল ও মার্কিন প্রশাসন ইরাক ভাঙ্গার দায়িত্ব নিজের কাঁধে না নিয়ে এ দায়িত্ব ইরাকের ভবিষ্যৎ প্রশাসনের কাঁধে চাপিয়ে দিতে চাইছে। এটা অচিরে নিষ্পত্তি করা হবে বলে কুর্দিস্তানের চেয়ারম্যান তালাবানী জানিয়েছেন।

লিবিয়ার ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র ধ্বংস করার ঘোষণা

গত ১৯ ডিসেম্বর লিবিয়া তার ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র ধ্বংস করার ঘোষণা দিয়েছে। একই সঙ্গে দেশটি স্বীকার করেছে যে, তারা

রাসায়নিক অস্ত্র তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছিল। এ ঘোষণা দেয়ার পর লিবীয় নেতা মুয়াম্মার গাদ্দাফী বলেন, লিবিয়ার এই বিচক্ষণ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হয় যে, তার দেশ বিশ্বকে ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র ও সব ধরনের সন্ত্রাসবাদ থেকে মুক্ত করতে একটি আন্তর্জাতিক ভূমিকা পালন করছে। এক বিবৃতিতে বলা হয়, মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকাকে একটি পরমাণুমুক্ত অঞ্চলে পরিণত করতে লিবিয়ার আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। লিবিয়া অন্যান্য দেশগুলির প্রতি এ উদাহরণ অনুসরণ করার আহ্বান জানিয়েছে। লিবিয়া নেতার এরূপ সিদ্ধান্তকে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন স্বাগত জানিয়েছে। সিনিয়র মার্কিন কর্মকর্তারা বলেন, গত মার্চ থেকে শুরু হওয়া গোপন আলোচনার ভিত্তিতে লিবিয়া এ সিদ্ধান্ত নেয়।

লোহিত সাগরে ১৪৮ যাত্রীসহ মিসরীয় বিমান বিধ্বস্ত

মিসরের একটি ভাড়া করা ৭৩৭-বোয়িং জেট বিমান গত ৩ জানুয়ারী লোহিত সাগরে বিধ্বস্ত হ'লে ১৪৮ জন যাত্রীর সবাই নিহত হয়। যাত্রীদের বেশির ভাগই ছিল ফরাসী পর্যটক। শার্ম আল-শেখ নামক পর্যটন কেন্দ্র থেকে বিমানটি উড্ডয়নের কিছুক্ষণ পর বিধ্বস্ত হয়। মিসরের কর্মকর্তারা জানান, দুর্ঘটনা থেকে কেউ বেঁচে গেছেন এমন কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। স্থানীয় সময় ভোর ৫-টায় এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। গোপন সূত্রে এক কর্মকর্তা জানায়, ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসগামী বিমানটি ক্রু পাল্টানোর জন্য কায়রো বিমানবন্দরে অবতরণের কথা ছিল। কিন্তু বিমানটি দক্ষিণ দিক থেকে বিমানবন্দরের কাছে আসার পর নিখোঁজ হয়ে যায়।

মৃত্যু সংবাদ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার অধ্যক্ষ শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফীর ছোট ভাই মাওলানা বদরুদ্দোজা (৫২) গত ২৬ ডিসেম্বর '০৩ দিবাগত রাত ১-টায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তার নিজ বাড়ী রাজশাহী যেলার গোদাগাড়ী থানাধীন সারাংপুর থেকে হাসপাতালে নেওয়ার পথে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজে'উন। মৃত্যু কালে তিনি স্ত্রী, ২ ছেলে ও ২ মেয়ে রেখে যান। পরদিন বাদ যোহর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফীর ইমামতিতে জানাযার ছালাত শেষে তাঁকে সারাংপুর সরকারী গোরস্থানে দাফন করা হয়। তাঁর জানাযার ছালাতে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ডঃ মুহাম্মাদ **আসাদুল্লাহ আল-গালিব**, কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক শিহাবুদ্দীন আহমাদ, 'সোনামণি' সংগঠনের কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক ইমামুদ্দীন, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া মাদরাসার শিক্ষক ও ছাত্র সহ গোদাগাড়ীর স্থানীয় বহু সংখ্যক আলেম ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ শরীক হন।

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফারেগ মাওলানা বদরুদ্দোজা কর্মজীবনে 'রাবেতায়ে আলমে ইসলামী'-এর মুবাল্লিগ হিসাবে ১৯৮২ সালে মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকায় যোগদান করেন। অতঃপর নিজ এলাকা বাসুদেবপুর ইসলামিয়া মাদরাসা ও সুলতানগঞ্জ জামে'আ সালাফিইয়াহ দাখিল মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। তিনি ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০২ সালে ১০ মাসের শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে মক্কা গমন করেন এবং ৩০ জুন ২০০৩ তারিখে দেশে ফিরে আসেন।

মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন এবং তাঁর শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেন।

[আমরা মরহুমের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। -সম্পাদক]

বদলে যাচ্ছে শীতের বৈশিষ্ট্য

সাম্প্রতিককালে শীতঋতুর স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য দ্রুত বদলে যাচ্ছে। আবহাওয়াবিদরা জানান, শীতকালের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সন্ধ্যার পর থেকেই তাপমাত্রার ব্যাপক পতন ঘটে রাতে জাঁকিয়ে শীত নামবে। সেই সাথে থাকবে কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা। কিন্তু দিনে সূর্যোদয়ের পর থেকেই আবার রাতের কুয়াশা কেটে গিয়ে তাপমাত্রার দ্রুত বৃদ্ধি ঘটবে এবং সারাদিনই সূর্যের সরাসরি উপস্থিতিতে শুষ্ক ও উষ্ণ আবহাওয়া বিরাজ করবে। এ সময় রোদে গেলেই বেশ গরম অনুভূত হবে এবং দিন ও রাতের তাপমাত্রার ব্যবধান থাকবে অনেক। অর্থাৎ রাত ও দিনের তাপমাত্রার পার্থক্য হবে প্রায় ১৫/২০ ডিগ্রী। অথচ ইদানিং শীতের এই অনাদিকালের বৈশিষ্ট্য হিমালয় ও বঙ্গোপসাগরের মধ্যবর্তী বাংলাদেশে দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে। শীতের প্রধান সময় পৌষ-মাঘে নাতিশীতোষ্ণ বাংলাদেশের আকাশ অধিকাংশ সময় ঘন কুয়াশা ও মেঘে আচ্ছন্ন থাকছে। ফলে সারাদিনেও সূর্যের মুখ দেখা যাচ্ছে না। সন্ধ্যা হ'তে না হ'তেই বৃষ্টির মত কুয়াশা পড়ছে। তাই শীতের তীব্রতা যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি পরিবেশগতভাবে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে জীবজগৎ, গাছপালা ও এদেশের ঐতিহ্যবাহী কৃষি ব্যবস্থা। এতে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাও যাচ্ছে পাল্টে। দিনের সূর্য কুয়াশা-মেঘে ঢাকা পড়ায় পরিবেশের ভারসাম্যও হয়ে উঠছে প্রচণ্ড হুমকির সম্মুখীন। এভাবে সূর্যকিরণ কমতে থাকলে বাংলাদেশে অদূর ভবিষ্যতে ভয়াবহ পরিবেশ বিপর্যয়ের আশংকা দেখা দেবে। বিশেষ করে কৃষি ক্ষেত্রে ঘটবে চরম বিপর্যয়। সমুদ্রের পানির উচ্চতাও বেড়ে যাবে।

পরিবেশ বান্ধব বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট

জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে পরিবেশ বান্ধব জ্বালানি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট। প্রায় বিনামূল্যে জ্বালানি ব্যবহার এবং উচ্ছিষ্ট অংশ বিক্রি করে লাভবান হওয়া যায় এ পদ্ধতিতে। জানা গেছে, বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করতে প্রথমেই প্রয়োজন হয় নিজস্ব পাঁচ-ছয়টি গরু বা মহিষ, যা থেকে প্রতিদিন ৬০ থেকে ৭০ কেজি গোবর পাওয়া সম্ভব। এ গোবর প্রয়োজনীয় পানির সঙ্গে মিশিয়ে স্লারি তৈরী করতে হবে। সাত-আট সদস্যের জন্য মূলতঃ ২৬০ সেন্টিমিটার ব্যাস এবং ২২১ সেন্টিমিটার গভীর একটি গোলাকার কুয়া বানাতে হবে। যার তলদেশ চাড়ির আকৃতির এবং উপরের ঢাকনিও গোলাকার হবে। ঐ স্লারি গোলাকার কুয়ার ভেতর বায়ুহীন অবস্থায় পচবে এবং গ্যাস উৎপাদন শুরু হবে। গোলাকার কুয়ার উপরে মাঝখানে পাইপ সংযোগ দিয়ে গ্যাস বের করে রান্না ও অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা যাবে। ঐ বায়ুহীন গ্যাস চেম্বার, কুয়ার ইনলেট ট্যাঙ্ক ও আউট লেট ট্যাঙ্ক ইট, বালু ও সিমেন্ট দিয়ে তৈরী করা হয়। এখানে কোন রডের প্রয়োজন হয় না। তবে গোবর ছাড়াও যেকোন পচনশীল জৈব পদার্থ যেমন হাঁস-মুরগীর বিষ্ঠা, মলমূত্র, আবর্জনা, কচুরিপানা, লতাপাতা ইত্যাদি দিয়েও বায়োগ্যাস তৈরী করা যায়। এ গ্যাস রঙবিহীন এবং অধিক তাপ হয়ে থাকে। প্রতিটি এ রকম প্ল্যান্ট স্থাপনে ১১ থেকে ১২ হাযার টাকা প্রথমেই প্রয়োজন হয়। প্রাথমিক ব্যয় ব্যবহারকারীকে বহন করতে হয়। এ ক্ষেত্রে প্ল্যান্ট স্থাপনকারী পরে সাড়ে ৭ হাযার টাকা সরকারী সহায়তা পাবেন। বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ এ অর্থ দেয়। বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট দেশের প্রতিটি এলাকায় স্থাপন করে পরিচ্ছন্ন জ্বালানি গ্যাস, উন্নতমানের জৈব সার, দূষণমুক্ত পরিবেশ ও বিদ্যমান বেকার সমস্যার সমাধান সম্ভব।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

যেলা সম্মেলন

অহি-ভিত্তিক ইসলামী সমাজ গড়ে তুলুন

-যেলা সম্মেলনে মুহতারাম আমীরে জামা'আত

সিলেটঃ গত ১০ জানুয়ারী '০৪ রোজ শনিবার সকাল ১০ ঘটিকা হ'তে মাগরিব পর্যন্ত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিলেট সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে মহানগরীর শাহজালাল দরগা গেইটস্থ শহীদ সুলেমান হলে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলন ২০০৪-য়ে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** জনগণের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিলেট যেলা সভাপতি জনাব আব্দুছ ছবূর চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও মাওলানা জালালুদ্দীন-এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত যেলা সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-হাদীছ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ মুযযাম্মিল আলী সিলেটী, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ, মুফতী তাহরুল ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার আবুল বাশার, জনাব আবিদ আলী, সিলেট যেলা উপদেষ্টা শেখ মুহাম্মাদ ফিরোজ, ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ নাছীরুদ্দীন, সিলেট যেলা সংগঠনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলাম, 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সিলেট যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল কবীর ও 'সোনামণি' যেলা পরিচালক মুহাম্মাদ নাঈমুল ইসলাম। সম্মেলনে তেলাওয়াত ও জাগরণী পরিবেশন করেন মুহাম্মাদ আব্দুল কবীর, তাজুল ইসলাম, তাসলীম চৌধুরী ও 'সোনামণি' সিলেট মহানগরী সদস্য আহমাদ ছানী প্রমুখ।

প্রধান অতিথি স্বীয় ভাষণে 'ইবাদত'-এর মূল বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন এবং তাওহীদ ও শিরকের পার্থক্য তুলে ধরে বলেন, ইসলামী আন্দোলনে 'শিরক' উৎখাতই হ'ল প্রধান বিষয়, বাকী সবই গৌণ। অথচ বাংলাদেশে ইবাদাত ও মু'আমালাত তথা ধর্মীয় ও বৈষয়িক উভয় ক্ষেত্রে 'শিরক' ব্যাপকহারে দানা বেঁধে আছে। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' উভয়বিধ শিরকের বিরুদ্ধে একটি মূর্তিমান চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। তিনি যাবতীয় শিরক ও বিদ'আত পরিত্যাগ করে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে দেশের আইন ও শাসন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর উদাত্ত আহ্বান জানান। বিশেষ অতিথির ভাষণে ডঃ মুছলেহুদ্দীন বলেন, ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও নেতৃত্বের রূপরেখা আজকের সমাজে অনুপস্থিত। তিনি শাসন ব্যবস্থাকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে বিন্যস্ত করার আহ্বান জানান। সম্মেলনে সকল বক্তা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক নির্ভেজাল ইসলামী সমাজ গড়ার আহ্বান জানান।

মহিলা সমাবেশঃ ইতিপূর্বে সকাল ১১-টায় অনুষ্ঠিত পৃথক মহিলা সমাবেশে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, নির্ভেজাল ইসলামী সমাজ বিনির্মানে মা-বোনদের অবদান অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তিনি তাদেরকে স্ব স্ব পরিবারে ইসলামী পরিবেশ তৈরীর কারিগর হিসাবে অভিহিত করেন এবং নিয়মিত সাংগঠনিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে উক্ত লক্ষ্য বাস্তবায়নে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

দায়িত্বশীল বৈঠকঃ বাদ মাগরিব যেলা সভাপতি জনাব আব্দুছ ছবূর চৌধুরীর সভাপতিত্বে সংগঠনের যেলা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত 'আন্দোলন' 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র দায়িত্বশীল বৈঠকে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, সিলেট মহানগরীতে অত্যন্ত স্পর্শকাতর স্থানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর পরপর দু'টি যেলা সম্মেলন অনুষ্ঠান নিঃসন্দেহে আপনাদের দাওয়াত আল্লাহ্র নিকটে কবুল হওয়ার অন্যতম বাস্তব প্রমাণ। আপনারা অধিক দায়িত্বশীলতা ও দূরদর্শিতার সাথে সম্মুখে এগিয়ে চলুন এবং পরিকল্পিতভাবে সকল পর্যায়ের জনগণের নিকটে আহলেহাদীছ আন্দোলনের নির্ভেজাল ইসলামী দাওয়াত পৌঁছে দিন। কর্মীদেরকে 'আন্দোলন'-এর সাহিত্য বেশী বেশী করে নিয়মিত পাঠ করার এবং যেলায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীবাহিনী গড়ে তোলার আহ্বান জানান। ডঃ মুছলেহুদ্দীন তাঁর বক্তব্যে কর্মীদেরকে নির্ভীকভাবে তাদের পবিত্র দায়িত্ব পালনে এবং সংগঠনের প্রতি অধিক নিবেদিত প্রাণ হওয়ার আহ্বান জানান।

'আন্দোলন'-এর 'সাধারণ পরিষদ সদস্য' ডঃ মুযযাম্মিল আলী, আহলেহাদীছ যুবসংঘের সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাওলানা জালালুদ্দীন, বর্তমান প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ প্রমুখ উক্ত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলনে যেলার বিভিন্ন প্রান্ত হ'তে সকাল থেকেই কয়েকটি রিজার্ভ বাসযোগে বিপুল উৎসাহে কর্মীরা আগমন করেন এবং সম্মেলন শেষে রাতে ফিরে যান। ২০০১ সালে একই স্থানে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের দ্বিগুণের বেশী কর্মী সমাবেশ ঘটায় হলের বাইরে কর্মীদের দাঁড়িয়ে ও বসে থাকতে হয়। সম্মেলন উপলক্ষে সিলেট শহরে ব্যাপক পোষ্টারিং করা হয় এবং দু'দিন পূর্ব থেকেই 'সকল বিধান বাতিল কর, অহি-র বিধান কায়েম কর' 'মুক্তির একই পথ, দাওয়াত ও জিহাদ' 'শিরক-বিদ'আতের উৎসাদন, আহলেহাদীছ আন্দোলন' 'তাক্বলীদে শাখছীর অপনোদন, আহলেহাদীছ আন্দোলন' 'বিদ'আতীদের আতংক, আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ইত্যাদি শ্লোগান দিয়ে ব্যাপক মাইকিং করা হয় এবং স্থানীয় ৫টি পত্রিকায় দু'দিন পূর্ব থেকেই সম্মেলনের আগাম খবর প্রকাশিত হয়। সম্মেলনের

পরেও ছবিসহ পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়।

যেলা সম্মেলন '০৪ উপলক্ষে সিলেট যেলা 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র পক্ষ থেকে বিশেষ পকেট ডায়েরী বের করা হয় এবং সম্মেলন স্থলে সংগঠনের বইপত্র ও ক্যাসেট বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়, যা সুধীমহলে প্রশংসিত হয়।

যেলা সম্মেলনে উপস্থিত সচেতন কর্মী ও সুধীবৃন্দের পক্ষ থেকে দেশের সরকার ও প্রশাসনের নিকট নিম্নোক্ত দাবীসমূহ পেশ করা হয়ঃ-

১. দেশের আইন ও শাসন ব্যবস্থাকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ঢেলে সাজাতে হবে।

২. বৃটিশ আমল থেকে প্রচলিত এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বি-মুখী ধারাকে সমন্বিত করে একটি গণমুখী ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হউক।

৩. সরকার পরিচালিত ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট মাযহাবের পরিবর্তে নিরপেক্ষভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক গ্রন্থ সমূহ প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. এ সম্মেলন যুব চরিত্র বিধ্বংসী অশ্লীল বই-পত্র, সাহিত্য ও ছবি সমূহ প্রদর্শনের অনুমোদন চিরতরে বন্ধ ঘোষণার দাবী জানাচ্ছে।

৫. দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের কঠোর পদক্ষেপ দাবী করছে।

৬. শুধু বই বাযেয়াফ্ত করা নয়, এ সম্মেলন কাদিয়ানীদের অনতিবিলম্বে অমুসলিম ঘোষণার দাবী জানাচ্ছে।

৭. এ সম্মেলন ইঙ্গ-মার্কিণ চক্র কর্তৃক আফগানিস্তান ও ইরাক দখল সহ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মুসলিম নিধন ও নির্যাতনের তীব্র নিন্দা করছে।

উল্লেখ্য যে, আগের দিন শুক্রবার বাদ জুম'আ রাজশাহী থেকে বিমান যোগে সন্ধ্যায় ঢাকা এসে সেখান থেকে বিমানযোগে রাত্রি সাড়ে ৮-টায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অবতরণ করলে যেলা সাধারণ সম্পাদক জনাব আব্দুল্লাহ আল-ছিদ্দীক্ব, ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ জাহিদুল ইসলাম ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ তাঁকে অভ্যর্থনা জানান এবং ১১ তারিখ সকালের ফ্লাইটে যেলা নেতৃবৃন্দ তাঁকে বিদায় জানান।

তাবলীগী সভা

মেহেরপুর ২৫ ডিসেম্বর ২০০৩ বৃহস্পতিবারঃ অদ্য সকাল ১০-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মেহেরপুর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে ঐতিহাসিক মুজিবনগরের অদূরে গৌণিনগর জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে মুহাম্মাদ আজমতুল্লাহ্র সভাপতিত্বে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক মুহাম্মাদ আহসান হাবীব-এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক জনাব অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, বিশেষ অতিথি ছিলেন মজলিসে শূরা সদস্য ও কুষ্টিয়া-পশ্চিম যেলা সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ গোলাম যিল-কিবরিয়া। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান মীযান, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ ও মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম প্রমুখ। উল্লেখ্য যে, চুয়াডাঙ্গা, দর্শনা, মুজিবনগর, দামুড়হুদা, গাংনী প্রভৃতি এলাকা থেকে প্রায় সহস্রাধিক দায়িত্বশীল ও কর্মী বৃন্দ উক্ত সভায় যোগদান করেন।

যশোর ২ জানুয়ারী ২০০৪ শুক্রবারঃ অদ্য যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে স্থানীয় ষষ্ঠিতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। প্রধান অতিথি স্বীয় ভাষণে যেলায় 'আন্দোলন'-এর তৎপরতা বৃদ্ধির জন্য কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান ও মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করেন।

চাঁদপুর ও নোয়াখালী সাংগঠনিক সফর

গত ২৬ ডিসেম্বর ২০০৩ চাঁদপুর যেলার বাখরপুরে এবং ২৭ ডিসেম্বর ২০০৩ নোয়াখালীর চাটখিলে সাংগঠনিক সফর করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মজলিসে শূরা সদস্য ও কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ এবং 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন। প্রথম দিন বাদ মাগরিব নেতৃবৃন্দ বাখরপুরে এক ইসলামী মাহফিলে বক্তব্য রাখেন। উক্ত মাহফিলে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কুমিল্লা যেলা 'যুবসংঘে'র অর্থ সম্পাদক জনাব হেমায়েত হোসাইন হেলাল ও মাওলানা আবদুল কুদ্দূস প্রমুখ। পরদিন বাদ ফজর নেতৃবৃন্দ এলাকা দায়িত্বশীলদের সাথে এক বিশেষ বৈঠকে মিলিত হন। বিকাল ৩-টায় তাঁরা নোয়াখালীর চাটখিলের জীবন নগর উচ্চ বিদ্যালয়ে জনাব সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগদান করেন। জনাব হেমায়েত হোসাইন-এর দরসে কুরআনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ শুরু হয়। অতঃপর নেতৃবৃন্দ সংগঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, মূলনীতি ও কর্মসূচীসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

যুবসংঘ

চট্টগ্রাম ১২ ডিসেম্বর '০৩ রোজ শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ মহানগরীর ঝাউতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদূদ-এর তাবলীগী সফর উপলক্ষ্যে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় হামদ ও না'তের পর তিনি মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সালাম পৌঁছে দিয়ে মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে এক সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, পরিবর্তিত

বিশ্ব পরিস্থিতিতে মুসলিম যুবকরা আজ দিকভ্রান্ত। তাদেরকে পথে আনার মহান দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' দেশের সর্বত্র কাজ করে যাচ্ছে। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দাওয়াতকে সারাদেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বানুভূতি এবং আহলেহাদীছদের হাযার বছরের ঐতিহ্য, আজ আমাদেরকে এ পথে নামতে উৎসাহিত করেছে। জাহান্নামের ভয় ও জান্নাতের মহা সুখ আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছে এ পথে জীবন বিলীন করতে। তিনি আল্লাহ্র পথে সময়, শ্রম ও অর্থের কুরবানীর মাধ্যমে অহি-ভিত্তিক ইসলামী সমাজ গড়ার আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য যুবকদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

অশ্লীল ছবি প্রদর্শনের প্রতিবাদে মিছিল ও সমাবেশ

কুমিল্লা ২৭ ডিসেম্বর শনিবারঃ অদ্য বিকাল ৫ ঘটিকায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বুড়িচং এলাকার যৌথ উদ্যোগে স্থানীয় 'আল-হেরা' মডার্ণ একাডেমী মাঠে সিনেমা হলে ও ভিডিও দোকানে অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ ছবি প্রদর্শনের প্রতিবাদে এক সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি উপযেলার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। প্রতিবাদ সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদূদ। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বুড়িচং শাখার সভাপতি জনাব ইদ্রীস ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার রোছমত আলী, সাহিত্য ও গবেষণা সম্পাদক মাওলানা শামসুল হক, দফতর সম্পাদক হুমায়ূন কবীর, বুড়িচং শাখার সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাযযাক ভূঁইয়া, মুক্তিযোদ্ধা আবদুর রাযযাক, 'আল-হেরা' মডার্ণ একাডেমীর অধ্যক্ষ এম, এ, মোর্শেদ, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি জনাব আবু তাহের, দফতর সম্পাদক জা'ফর ইকরাম, বুড়িচং এলাকা সেক্রেটারী কাওছার আহমাদ ও গাযী ওছমান গণী, বশীর আল-হেলাল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

প্রধান অতিথি স্বীয় ভাষণে বলেন, এসব নোংরা ছবি চলতে থাকলে আইন-শৃংখলার অবনতি ঘটা অবশ্যম্ভাবী। বিভিন্ন ভিডিও দোকান, ছবি ঘর, সিনেমা হলে অশ্লীল ছবি প্রদর্শন ও নীল ছবির ক্যাসেট বিক্রি চিরতরে বন্ধ না হ'লে যুব চরিত্র ক্রমশঃ ধ্বংসের দিকে ধাবিত হবে। তিনি বলেন, ঐতিহ্যগতভাবে আমরা খারাপ কাজে বাঁধা দেয়ার উত্তরাধিকারী। জিহাদ আন্দোলন, বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন ও তিতুমীরের উত্তরাধিকারী হিসাবে পূর্বের কর্মকাণ্ডের ন্যায় আমরা এসব নোংরা ছবি প্রদর্শনের প্রতিবাদ জানাই।

'আল-হেরা' মডার্ণ একাডেমী চত্বর, বসুন্ধরা চত্বর ও উপযেলা পরিষদ চত্বরে অনুষ্ঠিত পৃথক পৃথক সমাবেশে বিপুল সংখ্যক সচেতন তাওহীদি জনতা সমবেত হন। মিছিল ও পথসভা শেষে উপযেলা নির্বাহী অফিসার মুহাম্মাদ মাকছুদুর রহমান-এর নিকটে স্মারকলিপি পেশ করা হয়। এ সময় স্থানীয় ইউ,এন,ও এ বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

মৃত্যু সংবাদ

দেশের প্রবীণ আলেম, মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকার ভাইস প্রিন্সিপ্যাল শায়খুল হাদীছ মাওলানা আহমাদুল্লাহ রহমানী নাসিরাবাদী (৯০) গত ১২ জানুয়ারী '০৪ দিবাগত রাত ৩-১০ মিনিটে মাদরাসায় নিজ কক্ষে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লা-হি...। মৃত্যুকালে তিনি ৩ ছেলে, ৫ মেয়ে বহু ছাত্র ও গুণগ্রাহী রেখে যান। পরদিন সকাল ১০-টায় মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া-র প্রিন্সিপাল মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফীর ইমামতিতে মাদরাসা সংলগ্ন মসজিদে তার প্রথম জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর তাঁর নিজ গ্রামের বাড়ী ময়মনসিংহ যেলার ত্রিশাল থানাধীন জামতলীতে দ্বিতীয় জানাযা শেষে তাঁকে সেখানে দাফন করা হয়। তার জানাযার ছালাতে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলার কর্মী ও নেতৃবৃন্দ, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও আহলে হাদীস তাবলীগে ইসলাম-এর নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক সহ বিপুল সংখ্যক মুছল্লী শরীক হন।

মাওলানা রহমানী আনুমানিক ১৯১৪ সালের কোন এক সময়ে জামতলীতে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে নিজ গ্রামের দরসে নিযামী মাদরাসা অতঃপর ঢাকাস্থ আশরাফুল উলূম মাদরাসায় অধ্যয়নের পর তিনি দিল্লীর দারুলহাদীছ রহমানিয়া মাদরাসায় শায়খুল হাদীছ, মিশকাতের ভাষ্যকার আল্লামা ওবায়দুল্লাহ রহমানীর নিকট থেকে বুখারী, তিরমিযী, আবুদাঊদ, মুওয়াত্তা ইমাম মালেক ও নাযেমে দারুলহাদীছ রহমানিয়া মাওলানা নযীর আহমাদ আমলভীর নিকটে মুসলিম, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ পাঠ সম্পন্ন করেন। ১৯৪৩ সালে তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে 'সনদে ফারাগাত' লাভ করেন।

কর্মজীবনের শুরুতেই তিনি দিল্লী জামে আযম মাদরাসায় এক বৎসর শিক্ষকতা করেন। অতঃপর দারুলহাদীছ রহমানিয়ার স্বীয় উস্তাদগণের নির্দেশে উক্ত প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষকতায় নিয়োজিত হন। ভারত বিভাগের সময় তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১৯৪৮ সালের প্রথম ভাগে ময়মনসিংহ যেলার কাতলাসেন আলিয়া মাদরাসার হেড মাওলানা পদে যোগদান করেন। এখানে ৪ বৎসর শিক্ষকতার পর তিনি জামতলী মাদরাসায় যোগদান করেন। ১৯৬০ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে তিনি জামালপুর যেলার আরামনগর আলিয়া মাদরাসায় প্রথমে মুহাদ্দিছ ও পরে ভাইস প্রিন্সিপ্যাল পদে ২৭ বৎসর খিদমত আঞ্জাম দেন। অতঃপর ১৯৮৭ সালে অবসর গ্রহণের পর থেকে তিনি ঢাকার যাত্রাবাড়ী মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়াতে মুহাদ্দিছ পদে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। মৃত্যুর পূর্বের দিনও তিনি ক্লাশ নিয়েছেন।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন। তিনি তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করেন ও শোক সন্তপ্ত পরিবার বর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। উল্লেখ্য যে, ১৯৬৮-৬৯ সালে আরামনগর আলিয়া মাদরাসায় কামিল শ্রেণীতে অধ্যয়ন কালে মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাঁর ছাত্র ছিলেন।

[আমরা মরহুমের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। -সম্পাদক]

কাদিয়ানী বিভ্রাট

কাদিয়ানীদের দিনকাল বর্তমানে সবচেয়ে খারাপ যাচ্ছে। সম্প্রতি ঢাকার একজন বাম বুদ্ধিজীবী কাদিয়ানীদের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে পিটুনী খেয়ে একটি ক্লিনিকে ভর্তি হয়েছেন। এ খবর বখশীবাজারস্থ কাদিয়ানী হেড অফিসে পৌঁছার পর তার দু'শাগরেদকে বললেন, ঐ কমরেডকে গিয়ে দেখে আসা আমাদের দায়িত্ব। তোমরা যাও এবং তাকে খরচপত্র দিয়ে আস'। শাগরেদরা বলল, এসময় তার কাছে যাওয়া খুব রিস্কি। গণপিটুনি খেতে হতে পারে। কাদিয়ানী নেতা এসময় তাদের গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর বাণী পড়ে শোনালেন। 'বিপদে বেহুঁশ হওয়া সঠিক কাদিয়ানীর লক্ষণ নয়'। কিন্তু বাণীতে কাজ না হওয়ায় কাদিয়ানী নেতা নিজেই দু'শিষ্য নিয়ে রওয়ানা হ'লেন। কিছুদূর যেতেই সামনে এক কাদিয়ানী বিরোধী মিছিল দেখে নেতা স্বয়ং ভয়ে বেহুঁশ হয়ে রাস্তায় পড়ে গেলেন। দু'কাদিয়ানী শিষ্য তাকে ধরাধরি করে গুলিস্তান পাবলিক টয়লেটের সামনে নিয়ে মুখে পানি ছিটিয়ে দিলে তার জ্ঞান ফিরে আসে। তখন নেতাকে শিষ্য বলল, আপনি এভাবে বেহুঁশ হ'লেন কেন? বেহুঁশ হওয়া তো সঠিক কাদিয়ানীর লক্ষণ নয়'। কাদিয়ানী নেতা ক্রুদ্ধস্বরে বলল, চুপ থাক ব্যাটারা, আগে জান বাঁচাইয়া লই। বাঁচলে সঠিক-বেঠিক একটা হওয়া যাইব। না হয় নতুন কইরা কলেমা পইড়া মুসলমান হওয়ার চান্স তো পামু' [সংকলিত]।

জনমত কলাম

'হাজার না'ত' বইটি বাতিলের দাবী

কবি 'আহমদ নওয়াজ' রচিত কবিতা গ্রন্থ 'হাজার না'ত' অনন্ত প্রকাশনী হ'তে এম.এ.রশীদ কর্তৃক প্রকাশিত। প্রায় ১০০৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত এ গ্রন্থে কবি আহমদ নওয়াজ এমন সব আপত্তিকর কথা বলছেন, যা রীতিমত বাড়াবাড়ী, ঈমান বিধ্বংসী, ইসলামী আক্বীদা-বিশ্বাসের পরিপন্থী। তার পরিচয় দিতে গিয়ে গ্রন্থটির প্রকাশক নিজেই লিখেছেন-

'মহান সাধক আহমদ নওয়াজ নবী ও আউলিয়াদের সাথে সরাসরি কথা বলতেন। পরলোকগত যেকোন আত্মার সাথে কথা বলতেন। ফেরেশতাদের তিনি দেখতেন এবং তাদের সাথেও কথা বলতেন। তাঁহার নিকট ইলহাম আসত। এ কথাগুলো একজন সাধারণ মানুষের কাছে অবিশ্বাস্য হ'লেও সবই সত্য'।

প্রকাশকের উক্ত কথাগুলি বড়ই হাস্যকর ও বিভ্রান্তিকর। ৬ষ্ঠ পাতার মধ্যে মুহাম্মাদ শফী আহমদ নওয়াজের একটি কবিতাংশ এভাবে তুলে ধরেছেন-

'আমি হিন্দু, আমি মুসলিম,
আমি বৌদ্ধ, আমি খৃষ্টান,
স্রষ্টার আমি সৃষ্টির সেরা,
বিধাতার আমি অবদান।'

এখানে কবি নিজের পরিচয় তুলে ধরেছেন এবং প্রমাণ করেছেন যে, তিনি কোন আদর্শে বিশ্বাসী নন। 'আহমদ নওয়াজের' 'হাজার না'ত' কাব্যগ্রন্থ থেকে আরো কয়েকটি কবিতাংশ পাঠকের সামনে পেশ করা হ'ল-

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পানে রচিত তার কবিতা-

'সূর্য যেমন আছমানে,
নবী আছেন সবখানে' *(পৃঃ ২৯৫)*।
'মোবারক আরস পাকে
আছেন জাগি খোদার নবী' *(পৃঃ ২৭১)*।

উপরোক্ত পংক্তিদ্বয়ে তিনি প্রথমত রাসূল (ছাঃ)-কে সর্বত্র বিরাজমান বলেছেন। অতঃপর আরশে সমাসীন বলে প্রকাশ্য কুফরী করেছেন। কেননা আরশে একমাত্র বিশ্ব নিয়ন্তা আল্লাহ তা'আলা সমাসীন আছেন। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে,

'তিনি পরম দয়াময়, আরশে সমাসীন' *(ত্বা-হা ৫)*। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জীবিত নন। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই তোমার মৃত্যু হবে এবং তাদেরও মৃত্যু হবে' *(যুমার ৩০)*। অথচ কবি কুরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণাকে অস্বীকার করে বলেছেন, 'আছেন জাগি খোদার নবী।'

১৮ পৃষ্ঠায় কবি বলেছেন,

'দো-জাহানের বাদশাহ নবী,
কিবা তাঁহার শান,
নবীর প্রমাণ, নবী নিজে,
কে করে প্রমাণ।'

দো-জাহানের বাদশাহ একমাত্র আল্লাহ। আলোচ্য পংক্তিতে নবীকে দো-জাহানের বাদশাহ বলে কবি স্পষ্ট শিরক করেছেন, যা অমার্জনীয়। মহান আল্লাহ্‌র রাজত্বে কোন সৃষ্টির অংশদারিত্ব নেই।

৩৯০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে,

'ফেরেশতারা নবীর দাস,
দেখছি চেয়ে বার মাস।'

মূলতঃ ফেরেশতারা আল্লাহ্‌র দাস এবং তাঁরই সৃষ্টি। তাঁরা অবশ্যই নবীর দাস নন। আল্লাহ্‌র নির্দেশে তাঁরা নবী-রাসূলগণের নিকটে আগমন করতেন।

৩০২ পৃষ্ঠায় কবি লিখেছেন,

'যা কিছু চাও সবি আছে,
পাক নবীজির ভাণ্ডারে,
হাজার দ্বারের ধন্না ছাড়ি,
এবার এস সেই দ্বারে'

নিঃসন্দেহে এটি শিরকী ও কুফরী আক্বীদা। কারণ বান্দার সকল চাওয়া-পাওয়া হবে আল্লাহ্‌র দরবারে। কোন সৃষ্টির কাছে নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে সারাটি জীবন আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করেছেন। আল্লাহ বলেন, 'আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছু তাঁরই সমীপে প্রার্থনা করে' *(আর-রহমান ২৯)*।

হাদীছে এসেছে,

'তোমাদের প্রত্যেককেই নিজ পালনকর্তা আল্লাহ্‌র নিকটে যাবতীয় হাজতে ও প্রয়োজনের প্রার্থনা করা উচিত। এমনকি নিজের জুতার ফিতার জন্যও, যদি তা ছিড়ে যায়' *(তিরমিযী, হাকেম, মিশকাত পৃঃ ৫০)*।

এভাবেই কবি 'আহমদ নওয়াজ' রচিত কবিতাগ্রন্থ 'হাজার না'ত' মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তাওহীদী আক্বীদা-বিশ্বাসকে দূর করে শিরক ও কুফরী আক্বীদা-বিশ্বাসের বীজ বপণ করছে এবং ইসলামের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করছে।

অতএব, সরকারের নিকট আকুল আবেদন এই যে, দেশের মানুষকে তাওহীদী আক্বীদা-বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং শিরকী ও কুফরী আক্বীদামুক্ত করার পথকে সুগম করার লক্ষ্যে এই 'হাজার না'ত' বইটি বাজেয়াপ্ত করা হউক। যেহেতু এই গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রশংসায় অতিরঞ্জন করা হয়েছে এবং তাঁর জন্য আল্লাহ্‌র গুণাবলী সাব্যস্ত করা হয়েছে, সেহেতু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আরয এই যে, বইটির ছাপা, বিলি ও বিক্রি বন্ধ করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হৌক।

শিক্ষকবৃন্দ
জামেয়া কাসেমিয়া
গাবতলী, নরসিংদী।

প্রশ্নোত্তর

–দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/১৬১)ঃ 'যাহা বলিব সত্য বলিব; সত্য বৈ মিথ্যা বলিব না' কুরআনের উপর হাত রেখে আদালতে এরূপ শপথ করা কি শরী'আত সম্মত? কুরআনের উপর হাত রেখে উক্ত শপথের পর মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে বিশেষ ধরনের কোন পাপ হবে কি?

-শফীক
বাংলাদেশ নৌবাহিনী
চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ কুরআনের উপর হাত রেখে বা কুরআন হাতে নিয়ে শপথ করা সঠিক নয়। এ মর্মে কোন ছহীহ বা যঈফ হাদীছ পাওয়া যায় না। তবে পুরা কুরআনকে বা কোন সূরাকে স্রেফ 'কালামুল্লাহ' বা আল্লাহ্র বাণী মনে করে তার শপথ করার বিষয়টি অনেক বিদ্বান জায়েয বলেছেন। যদিও এর ভিত্তি কতকগুলি 'মুরসাল' হাদীছ মাত্র *(বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা পৃঃ ৪১-৪৩)*। ঐ সময় সংকলিত কুরআনকে উদ্দেশ্য না করে মূল কালামুল্লাহকে উদ্দেশ্য করে শপথ করতে হবে। কেননা কালামুল্লাহ আল্লাহ্র সত্তাগত গুণ, যা অবিচ্ছিন্ন *(মুহাম্মাদ ছালেহ আল-উছায়মীন, ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, পৃঃ ১৫৭)*। মিথ্যা সাক্ষ্য দান কবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত। কালামুল্লাহ্র শপথের পর মিথ্যা সাক্ষ্যদানে বিশেষ ধরনের কোন পাপ না হ'লেও এর দ্বারা কালামুল্লাহকে অবজ্ঞা করার গোনাহের সম্ভাবনা রয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১ 'কাবীরাহ গুনাহ ও মুনাফিকের আলামত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২/১৬২)ঃ আক্বীক্বা করে ছেলের নাম রেখেছি আব্দুল কুদ্দুস। কিন্তু ছেলের নানা-নানী ও অন্যান্যরা তাকে 'মাসুম' বলে ডাকে। প্রশ্ন হ'ল, আমরা কি তাকে মাসুম নামে ডাকতে পারব এবং মাসুম নামটি কি শরী'আত সম্মত?

-মুহাম্মাদ জলীলুর রহমান
সাজিন্দা, আমশট্ট
দুপচাঁচিয়া, বগুড়া।

উত্তরঃ সন্তান জন্মের ৭ম দিনে আক্বীক্বা করে যে আব্দুল কুদ্দুস নাম রাখা হয়েছে তা মূল নাম হিসাবে গৃহীত হবে। পরবর্তীতে তাকে দ্বিতীয় নামে ডাকাতে শারঈ কোন বাধা নেই। আর প্রত্যেক নামের পরিবর্তে আক্বীক্বা করতে হবে এমন কোন বিধানও শরী'আতে নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দাদা আব্দুল মুত্ত্বালিব তাঁর জন্মের ৭ম দিবসে আক্বীক্বা করে তাঁর নাম রাখেন 'মুহাম্মাদ' এবং তাঁর মাতা রাখেন 'আহমাদ' *(আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ২/২৪৭ পৃঃ; মনছূরপুরী, রাহমাতুল লিল আলামীন ১/৪০)*। [illegible] নাম হাদীছে পাওয়া যায় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৭৭৬-৭৭ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায়, 'নবীর নাম ও গুণাবলী' অনুচ্ছেদ)*।

'মাছূম' অর্থ দোষমুক্ত। নবীগণ ব্যতীত কেউ প্রকৃত অর্থে 'মাছূম' নন। অতএব এই ধরনের নাম না রাখাই উচিত। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈকা মহিলার 'বার্রাহ' (দোষমুক্ত) নাম পরিবর্তন করে 'যায়নাব' রাখেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭৫৬ 'শিষ্টাচার' অধ্যায় 'নাম সমূহ' অনুচ্ছেদ)*। অনুরূপভাবে তিনি মন্দ নামও পরিবর্তন করে দিতেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৭৭৪)*। তবে এ নাম রাখা যায় কেবল দোষমুক্ত বা পবিত্র থাকার আকাংখা থেকে। ঐ ব্যক্তি প্রকৃত অর্থে দোষমুক্ত এ জন্য নয়। কেননা ঐ ব্যক্তি নির্দোষ কি-না তা চূড়ান্তভাবে কেবল আল্লাহ বলতে পারেন। যেমন মৃত মুমিন ব্যক্তিকে 'মরহূম' বলা যায় কেবল কামনা অর্থে, খবর দেওয়া অর্থে নয়' *(উছায়মীন, ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম প্রশ্নোত্তর সংখ্যা ১০৬, পৃঃ ১৯৩)*।

প্রশ্নঃ (৩/১৬৩)ঃ অধিকাংশ ইমাম পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের দুই ওয়াক্তে মুছল্লীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসেন। বাকী তিন ওয়াক্তে বসেন না এজন্য যে, বাকী তিন ওয়াক্তে ফরয ছালাতের পরে আরো ছালাত আছে। এর বিশুদ্ধতা জানতে চাই।

-হাফেয মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ
ও
আলহাজ্জ আলাউদ্দীন আহমাদ
পাটিকাবাড়ী, পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তরঃ দুই ওয়াক্ত ছালাত শেষে মুখ ফিরিয়ে বসা আর বাকী তিন ওয়াক্ত ছালাত শেষে না বসার কোন প্রমাণ নেই। সামুরা ইবনে জুনদুব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন কোন ছালাত শেষ করতেন, তখন আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতেন *(বুখারী, মিশকাত হা/৯৪৪ 'ছালাত' অধ্যায়)*। অতএব পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের পর বাম দিক দিয়ে হৌক অথবা ডান দিক দিয়ে হৌক মুক্তাদীগণের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসাই শরী'আত সম্মত *(মুসলিম, মির'আতুল মাফাতীহ হা/৯৫৪-এর ব্যাখ্যা, ৩/৩০৪ পৃঃ 'তাশাহহুদে প্রার্থনা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৪/১৬৪)ঃ খুৎবার সময় ইমাম মিম্বরের কোন্ স্তরে বসবেন এবং কোন্ স্তরে দাঁড়িয়ে খুৎবা প্রদান করবেন?

-মুহাম্মাদ মুহসিন খাঁন
কাযিয়াতল, মুরাদনগর
কুমিল্লা।

উত্তরঃ আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি খেজুর গাছের গুড়ির গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন। পরে তাঁর জন্য একটি কাঠের মিম্বর তৈরী করা হয়, যা দুই স্তর [illegible] ছিল। তিনি তৃতীয় স্তরের উপরে বসতেন'... *(ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/১৭৭৭ সনদ হাসান)*। একই ধরনের বর্ণনা এসেছে ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে *(ছহীহ*

আবুদাঊদ হা/৯৫৮)। তবে আবদুল আযীয ইবনু আবী হাযেম এবং উবাই বিন কা'ব থেকে যথাক্রমে ছহীহ মুসলিম *(হা/৫৪৪)* এবং ইবনু মাজাহ *(ঐ, ছহীহ হা/১১৬৯)*-তে তিন স্তর বিশিষ্ট বলে বর্ণিত হয়েছে। এ দু'য়ের সমন্বয় করে ছাহেবে 'আওন বলেন যে, যে রাবী দুই স্তরের কথা বলেছেন, তিনি উপরের ঐ স্তরকে গণ্য করেননি, যার উপরে রাসূল (ছাঃ) বসতেন *(আওনুল মা'বূদ হা/১০৬৮-এর ব্যাখ্যা ৩/৪২২)*। যে কথাটি ইবনু খুযায়মার বর্ণনায় স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

বর্তমানে আমাদের দেশে দুই স্তর বিশিষ্ট যে মিম্বর চালু আছে, তা রাসূলের মিম্বরের হুবহু অনুকরণে তৈরী। মিম্বরের সর্বোচ্চ পাটাতনকে স্তর হিসাবে গণ্য করলে যাকে তিন স্তর বিশিষ্ট বলা যাবে। তবে আমীর মু'আবিয়া (রাঃ)-এর খেলাফতকালে (৪১-৬০ হিঃ) মারওয়ান ইবনুল হিকাম নীচের দিক থেকে আরও তিনটি স্তর বৃদ্ধি করে উক্ত মিম্বরকে মোট ৬টি স্তরে পরিণত করেন *(আওন ৩/৪২২)*।

আবুল হাসান আলী বিন আহমাদ আল-মুরদাভী (৮১৭-৮৮৫ হিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিম্বরের ৩য় স্তরে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিয়েছেন। আবুবকর (রাঃ) ২য় স্তরে এবং ওমর (রাঃ) ১ম স্তরে (নীচের স্তরে) দাঁড়িয়ে খুৎবা দিয়েছেন। পরবর্তীতে ওছমান (রাঃ) ২য় স্তরে এবং আলী (রাঃ) সর্বোচ্চ স্তরে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিয়েছেন। তবে পরবর্তী খলীফাগণ সকলে ওমরের স্তরে (অর্থাৎ নীচের স্তরে) দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন *(আল-ইনছাফ ৫/২৩৫)*। অতএব ইমাম তাঁর সুবিধামত মিম্বরের যেকোন স্তরে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতে পারেন।

প্রশ্নঃ (৫/১৬৫)ঃ দশ বছর পূর্বে দলীয় বিতর্কের কারণে গ্রামের জামে মসজিদ ছেড়ে একই গ্রামের বাজারে একদল লোক পৃথকভাবে জামে মসজিদ নির্মাণ করে। বর্তমানে বাজার মসজিদে সর্বদলীয় লোকজন এবং বাজারের ক্রেতা-বিক্রেতা সবাই ছালাত আদায় করে। প্রশ্ন হ'ল, উক্ত মসজিদটি কি 'মসজিদে যেরার'-এর অন্তর্ভুক্ত হবে? যদি হয় তাহ'লে সংশোধনের উপায় কি? সেই সাথে মসজিদের জায়গা ওয়াক্ফ করার প্রয়োজন আছে কি?

-মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম
সহকারী শিক্ষক
রাজশাহী চিনিকল উচ্চ বিদ্যালয়
রাজশাহী।

উত্তরঃ শারঈ কারণ ব্যতীত কেবল পারস্পরিক দলাদলি করে নতুনভাবে মসজিদ নির্মাণ করলে সেটি 'মসজিদে যেরার'-এর অন্তর্ভুক্ত হবে *(তওবা ১০৭)* এবং উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় করা জায়েয হবে না। তবে গ্রামবাসী আপোষে নিজেদের মধ্যকার হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে সম্মিলিতভাবে বাজারের মসজিদে ছালাত আদায় করলে যেরার-এর আওতা থেকে মুক্ত হ'তে পারে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ বলেন, 'মুমিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই। অতএব তোমরা তোমাদের দু'ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে, যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও' *(হুজুরাত ১০)*।

মসজিদের জায়গা ওয়াক্ফ হওয়া আবশ্যক। আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় পৌঁছে মসজিদ নির্মাণ করার আদেশ দিলেন এবং বললেন, 'হে বনু নাজ্জার! তোমরা আমার নিকট এ বাগানটি বিক্রয় করে দাও। তাঁরা বলল, না। আল্লাহ্র কসম! আমরা এর বিনিময় একমাত্র আল্লাহ্র নিকটে কামনা করি' *(বুখারী ১/৩৮৯ পৃঃ, 'মসজিদের জন্য জমি ওয়াক্ফ করা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৬/১৬৬)ঃ জনৈক 'যুক্তিবাদী' বক্তার ক্যাসেটে শুনলাম, ক্বিয়ামতের মাঠে আল্লাহ যখন 'মরিয়ম' বলে ডাক দিবেন, তখন হাযার হাযার মরিয়ম আল্লাহ্র ডাকে সাড়া দিবে। তখন ঈসা (আঃ)-এর মা মরিয়মের নামের গুণে সমস্ত মরিয়মকে আল্লাহ বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। উপরোক্ত কথাগুলি কি সঠিক?

-মুহাম্মাদ আবু তালেব
হরিরামপুর, বাঘা
রাজশাহী।

উত্তরঃ উল্লিখিত কথাগুলি মনগড়া ও ভিত্তিহীন। কারণ নবীগণের নামে অনেক মানুষের নাম রাখা হয়। তাই বলে কি তারা নবীগণের নামের গুণে বিনা হিসাবে জান্নাতে যেতে পারবে? এগুলি ইসলামী আক্বীদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

প্রশ্নঃ (৭/১৬৭)ঃ জামা'আতে ছালাত আদায় করার সময় এক মুক্তাদী হ'তে অপর মুক্তাদীর পা ফাঁকা বা মিলিয়ে রাখা সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে বিস্তারিত জানালে খুশী হব।

-আব্দুল ওয়াদূদ ভূঁইয়া
সিনিয়র শিক্ষক
বড়শালঘর এম,এ, উচ্চ বিদ্যালয়
দেবীদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ ছহীহ হাদীছে কাঁধের সাথে কাঁধ, পায়ের সাথে পা মিলিয়ে ফাঁক বন্ধ করে দাঁড়ানোর নির্দেশ পাওয়া যায়। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা কাতার সমূহে দুই ইট পরস্পরে মিলানোর ন্যায় মিলে দাঁড়াও এবং দুই কাতারের মাঝের ফাঁক নিকটবর্তী রাখবে। কাঁধসমূহ সমান্তরাল রাখবে। ফাঁক বন্ধ কর, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তার কসম, আমি শয়তানকে দেখি যে, কালো ছাগলের বাচ্চার মত সে তোমাদের কাতারের মাঝখানের ফাঁকে ঢুকছে' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১০৯৩, ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১০২৫)*।

আনাস (রাঃ) বলেন, আমাদের মধ্য থেকে একজন একে অপরের কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলিয়ে নিত। ছাহাবী নু'মান বিন বাশীরও অনুরূপ বলেন *(বুখারী ১/১০০ পৃঃ)*। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, তোমরা কাতার

সোজা কর, কাঁধ সমূহ সমানভাবে মিলাও, ফাঁক বন্ধ কর এবং শয়তানের জন্য কোন স্থান ফাঁকা রেখো না। কেননা যে ব্যক্তি কাতারে মিলে দাঁড়াল, আল্লাহ তার সঙ্গে মিলে থাকেন। আর যে ব্যক্তি তা কর্তন করল, আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক কর্তন করে থাকেন' *(আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ মিশকাত হা/১১০২)*। উক্ত হাদীছগুলি প্রমাণ করে যে, একজন মুছল্লী দাঁড়িয়ে তার ডান এবং বাম পাশের দু'জন মুছল্লীর পায়ের সাথে পা এবং কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে কাতার সোজা করে দাঁড়াবেন *(দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৮৯; আত-তাহরীক জুন '৯৮ প্রশ্নোত্তর ৪/৯৪)*।

প্রশ্নঃ (৮/১৬৮)ঃ বাংলাদেশের জনৈকা মুসলিম মহিলার ভারতীয় এক হিন্দু ছেলের সাথে বিবাহের পর দু'টি পুত্র সন্তান হয়েছে। যাদের বর্তমান বয়স ৮ ও ৬ বছর। উক্ত মহিলা ছেলে দু'টিসহ বাংলাদেশে তার পিতার নিকটে আসলে পিতা তাকে স্বামীর কাছে যেতে নিষেধ করেন এবং ছেলে দু'টিকে মুসলমান করতে চান। কিন্তু মহিলা ও ছেলে দু'টি ভারতে যাওয়ার জন্য কান্নাকাটি শুরু করে। এমতাবস্থায় উক্ত মহিলা ও ছেলে দু'টির করণীয় কি হ'তে পারে?

-মুহাম্মাদ আযীমুদ্দীন
কাকডাঙ্গা, কলারোয়া
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ শরী'আতের দৃষ্টিতে তাদের বিবাহ হয়নি। তারা ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর অন্তর্ভুক্ত। তাদের সন্তান-সন্ততি জারজ সন্তান হিসাবে পরিগণিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'এরা (মুসলমান নারীরা) কাফেরদের জন্য হালাল নয় এবং কাফের মহিলারাও তাদের জন্য হালাল নয়' *(মুমতাহানা ১০, তাফসীর ইবনু কাছীর ৪/৩৭৫ পৃঃ)*। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, 'ব্যভিচারী পুরুষ ব্যভিচারিণী নারী অথবা মুশরিক নারী ভিন্ন কাউকে বিবাহ করে না এবং ব্যভিচারিণী নারীকে ব্যভিচারী পুরুষ অথবা মুশরিক পুরুষ ভিন্ন অন্য কেউ বিবাহ করে না। মুসলমানদের জন্য এদেরকে হারাম করা হয়েছে' *(নূর ৩)*। অতএব হিন্দু যেহেতু কাফের এবং মুশরিক, সেহেতু তাদের সাথে কোন ঈমানদার মুসলিম রমণী বিবাহ বসতে পারে না।

প্রকাশ থাকে যে, উক্ত মহিলা যদি নিজের ধর্ম পরিত্যাগ করে বিধর্মীতে পরিণত হয়ে থাকে, তাহ'লে তাকে পুনরায় ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে। যদি সে দাওয়াত কবুল না করে তবে সে হত্যাযোগ্য অপরাধী। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন... 'যে ব্যক্তি তার দ্বীন ইসলামকে পরিবর্তন করবে, তাকে হত্যা কর' *(বুখারী ২/১০২৩ 'মুরতাদ ও আল্লাহদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধের বর্ণনা' অধ্যায়)*। ছেলে দু'টিকে তাদের ইচ্ছার উপরে ছেড়ে দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, ইসলামী হুদূদ বাস্তবায়নের অধিকার কেবলমাত্র ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারের, অন্যদের নয়।

প্রশ্নঃ (৯/১৬৯)ঃ রামাযান মাসে লায়লাতুল ক্বদরে পশু-পাখি, গাছপালা, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি নাকি আল্লাহকে সিজদা করে, এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-শেখ আব্দুছ ছামাদ
বুলারাটী, আলীপুর
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ পশু-পাখি, গাছ-পালা, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি নির্দিষ্টভাবে রামাযান মাসে ক্বদরের রাতে আল্লাহকে সিজদা করে এ কথা সঠিক নয়। তবে এগুলিসহ ফেরেশতাকুল ও আসমান-যমীনে যা কিছু আছে, সবাই যে আল্লাহকে সিজদা করে একথা পবিত্র কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহকে সিজদা করে যা কিছু নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে আছে এবং ফেরেশতাগণ, তারা অহংকার করে না' *(নাহল ৪৯)*। তবে এই সিজদা হ'ল তাদের যথাযোগ্য নিয়মে, যা আল্লাহ্র জন্য প্রযোজ্য।

প্রশ্নঃ (১০/১৭০)ঃ খারাপ মাল দ্বারা যাকাত প্রদান করলে যাকাত কবুল হবে কি? আর যাকাতদাতার উপর কোন গোনাহ বর্তাবে কি? আবার অনেককে দেখা যায়, ব্যক্তিগত রাগারাগির কারণে যাকাতের হকদার ব্যক্তিকে যাকাত দেননা। এমন আচরণ শরী'আত সম্মত কি?

-আযীযুর রহমান
চণ্ডিপুর, মণিরামপুর, যশোর।

উত্তরঃ ভাল মাল থাকা সত্ত্বেও খারাপ মাল দ্বারা যাকাত আদায় করা শরী'আত সম্মত নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে এবং যা আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় কর এবং তা থেকে নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করতে মনস্থ কর না। কেননা তোমরা নিজেরা কখনো তা নিতে রাযী হও না। তবে চক্ষু বন্ধ করে গ্রহণ করলে তা স্বতন্ত্র কথা' *(বাক্বারাহ ২৬৭)*।

সুতরাং উচ্চামানের মাল থাকা সত্ত্বেও নিম্ন মানের মাল দ্বারা যাকাত আদায় করলে তা পাপের কারণ হবে। আওফ ইবনু মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে প্রবেশ করে নিম্নমানের খেজুর ঝুলানো দেখে বললেন, এই দানকারী ব্যক্তি ইচ্ছা করলে এর চেয়ে উৎকৃষ্ট মাল দান করতে পারত। অতঃপর বললেন, এই ব্যক্তি অবশ্যই ক্বিয়ামতের দিন ঐ নিম্নমানের খাদ্যই খাবে *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/১৬০৮)*।

ব্যক্তিগত রাগারাগির কারণে যাকাতের হকদার ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা সমীচীন নয়। আয়েশা (রাঃ)-এর অপবাদের ঘটনায় মুনাফিকদের সাথে আবুবকর (রাঃ)-এর দরিদ্র খালাতো ভাই মিসতাহ যোগ দিয়েছিলেন। আল্লাহ যখন মা আয়েশাকে অপবাদ থেকে মুক্ত করলেন, তখন আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) রাগান্বিত হয়ে শপথ করে বলেন, আমি

মেসতাহকে যে ভাতা প্রদান করতাম, তা আর প্রদান করব না। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমার শপথ প্রত্যাহার কর এবং তাকে যে ভাতা প্রদান করতে তা প্রদান কর *(বুখারী ২/৫৯৫ 'যুদ্ধ-বিগ্রহ' অধ্যায় 'ইফ্কের বর্ণনা' অনুচ্ছেদ)*। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ক্রোধের বশবর্তী হয়ে কোন হকদারের হক বিনষ্ট করা যাবে না।

প্রশ্নঃ (১১/১৭১)ঃ মসজিদে ইমামের পিছনে এক পার্শ্বে পুরুষ ও এক পার্শ্বে মহিলারা ছালাত আদায় করছে। তবে উভয়ের মাঝে পর্দা রয়েছে। কিন্তু কাতারে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে উভয়ে একই কাতারে দাঁড়ায়। এভাবে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম
চকবিষ্ণুপুর, পোরশা, নওগাঁ।

উত্তরঃ মসজিদের মধ্যে ইমামের পিছনে পুরুষের কাতারের এক পার্শ্বে পর্দার মধ্যে থেকে কাতারবন্দী হয়ে মহিলাদের ছালাত আদায় করা জায়েয *(মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, 'মহিলাদের কাতারের হুকুম' অনুচ্ছেদ, পৃঃ ৩১০-৩১১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মহিলাদের সর্বোত্তম কাতার হ'ল পিছনের কাতার, আর নিকৃষ্ট কাতার হ'ল সামনের কাতার' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০৯২ 'কাতার সোজা করা' অনুচ্ছেদ 'ছালাত' অধ্যায়)*। তবে পর্দার ব্যবস্থা থাকলে (যেমন বর্তমান যুগে বিভিন্ন মসজিদে রয়েছে) মহিলাদের প্রথম কাতার ভাল হবে পিছনের কাতারের চাইতে। পর্দার অন্তরালে থাকলে এবং ইমামের তাকবীর শুনতে পেলে নারী-পুরুষ সমান্তরাল কাতারে দাঁড়ানোতে শরী'আতে কোন বাধা নেই *(বুখারী ১/১০১ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১২/১৭২)ঃ যিনি নিয়মিত 'আইয়ামে বীয'-এর ছিয়াম পালন করেন, তিনি শাওয়াল মাসের ৬টি ছিয়াম উক্ত তিন দিন ব্যতীত অন্য সময়ে আদায় করবেন? নাকি উক্ত তিনটি সহ মোট ৬টি ছিয়াম পালন করলে উভয় ছিয়ামের নেকী পাবেন?

-মোস্তফা
ধুরইল ডি.এইচ কামিল মাদরাসা
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ 'আইয়ামে বীয'-এর ছিয়াম এবং শাওয়াল মাসের ছিয়াম প্রত্যেকটির নেকী পৃথক। শাওয়াল মাসের ছিয়ামের হিসাব হ'ল রামাযানের সাথে। আর আইয়ামে বীয-এর হিসাব প্রত্যেক মাসের সাথে। অতএব যিনি নিয়মিত 'আইয়ামে বীয'-এর ছিয়াম পালন করেন, তিনি আইয়ামে বীয-এর তিনটি ছিয়াম এবং শাওয়াল মাসের ৬টি ছিয়াম পৃথক পৃথকভাবে পালন করবেন।

প্রশ্নঃ (১৩/১৭৩)ঃ নাছিরুদ্দীন আলবানী প্রণীত এবং আকরামুযযামান অনুদিত 'ছালাত সম্পাদনের পদ্ধতি' বই-য়ে তিন রাক'আত ও চার রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতে প্রথম বৈঠকে তাশাহ্হুদের পর দরূদ পাঠ করার যে বর্ণনা এসেছে, সে ব্যাপারে বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ হব।

-লিয়াকত আলী
৩৪২/১ মধ্য মাদারটেক
ঢাকা।

উত্তরঃ তাশাহ্হুদের পরে দরূদ পাঠের সাধারণ নির্দেশের আলোকেই শায়খ আলবানী অনুরূপ ফৎওয়া দিয়েছেন *(ছিফাতু ছালাতিন নবী পৃঃ ১৪৬)*। যদিও শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদের পরে দরূদ পাঠের বিষয়টি বিভিন্ন হাদীছ দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়। যেমন ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন প্রথম দু'রাক'আত শেষে বসতেন, তখন মনে হ'ত তিনি যেন গরম পাথরের উপরে বসেছেন'। এর দ্বারা তিনি অল্পক্ষণ বসতেন বুঝানো হয়েছে। আলবানী বলেন, তিরমিযী বর্ণিত উক্ত হাদীছটির সকল বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত। তবে তিরমিযী বলেন যে, ওবায়দাহ স্বীয় পিতা ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে হাদীছটি শোনেননি *(মিশকাত হা/৯১৫-এর টীকা)*। অর্থাৎ মুছল্লী প্রথম বৈঠকে কেবল 'আত্তাহিয়াতু' পড়েই উঠে যাবে, অন্য কিছু নয়। ইমাম তিরমিযী বলেন, এই আমল জারি রয়েছে বিদ্বানগণের নিকটে। এর বেশী কিছু পড়লে সিজদায়ে সহো দিতে হবে। ছাহেবে মির'আত বলেন, সিজদায়ে সহো দেওয়ার ব্যাপারে কোন হাদীছ নেই। তালখীছুল হাবীর ১০১ পৃষ্ঠায় বলেন, ইবনু আবী শায়বা ছহীহ সনদে বর্ণনা করেন যে, আবুবকর যখন প্রথম বৈঠকে বসতেন, তখন তিনি যেন গরম পাথরের উপরে বসতেন'। ইবনু ওমর থেকেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে। অতঃপর তিনি বলেন, আহমাদ ও ইবনু খুযায়মা বর্ণনা করেছেন যে, ইবনু মাসঊদ বলেন যে, তাঁকে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাশাহ্হুদ শিক্ষা দেন। ... অতঃপর তিনি ছালাতের মধ্যখানে হ'লে তাশাহ্হুদ পড়েই উঠে যেতেন। আর শেষ বৈঠক হ'লে তাশাহ্হুদের পরে ইচ্ছামত দো'আ করতেন। অতঃপর সালাম ফিরাতেন' *(ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/৭০৮ সনদ হাসান)*। অত্র হাদীছগুলির সমর্থনের কারণেই তিরমিযী স্বীয় বর্ণিত হাদীছকে 'হাসান' বলেছেন *(মির'আত ৩/২৪৩)*। ইবনুল ক্বাইয়িম বলেন, প্রথম বৈঠকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দরূদপাঠ করেছেন বলে কিছু বর্ণিত হয়নি। যিনি এটাকে মুস্তাহাব বলেন, তিনি দরূদ পাঠের সাধারণ নির্দেশের উপরে ধারণা করেই সম্ভবত এটা বলেন। যদিও শেষ বৈঠকে দরূদ পাঠের বিষয়টি বিশুদ্ধভাবে স্পষ্ট হয়ে গেছে' *(যাদুল মা'আদ ১/২৩৭; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১২৯)*।

প্রশ্নঃ (১৪/১৭৪)ঃ পবিত্র কুরআন হাত অথবা তাক থেকে পড়ে গেলে কিংবা অসাবধানতা বশতঃ পা লাগলে চুম্বন করা যাবে কি? না এর বিনিময়ে কিছু দিতে হবে?

-আনোয়ার
বাঁকড়া, চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তরঃ কুরআন সর্বাধিক উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন পবিত্র গ্রন্থ *(বুরূজ*

২২)। অনিচ্ছাকৃতভাবে কুরআন পড়ে গেলে কিংবা পা লাগলে চুম্বন করতে হবে না বা এর বিনিময়ে কিছু ছাদাক্বাহও করতে হবে না। তবে এই দুঃখজনক ঘটনা ঘটে গেলে সাথে সাথে ভীতি ও শ্রদ্ধার সাথে তওবার মন নিয়ে 'ইন্নালিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজে'ঊন' পড়তে হবে *(বাক্বারাহ ১৫৬; উম্মে সালামহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছ, মুসলিম, মিশকাত হা/১৬১৮ 'জানায়েয' অধ্যায়)*। কুরআনের মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রেখে সর্বদা সাবধানতা অবলম্বন করে চলতে হবে এবং কোনভাবেই যেন এর মর্যাদা ক্ষুণ্ন না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। সেকারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শত্রুভূমিতে কুরআন নিয়ে সফর করতে নিষেধ করেছেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২১৯৭, 'কুরআন পাঠের আদব' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৫/১৭৫)ঃ মসজিদের পূর্বদিকে বাইরে কবর আছে। মুছল্লীদের স্থান সংকুলান না হওয়ায় উক্ত কবরের উপরে দোতলা করে ছালাত আদায় করা যাবে কি? অনেকে বলেন, মসজিদ সংস্কারের সময় পুরাতন মসজিদের মেহরাব ও কাতার ছেড়ে দিয়ে ক্বিবলার দিকে বাড়ানো যাবে না এবং পুরাতন মসজিদের ছালাতের কোন স্থানে ওযূ খানাও করা যাবে না। মহিলাদের জন্য দোতলায় পুরুষদের পিছনে একটু দূরে পৃথক কামরায় ছালাত জায়েয হবে কি? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ জাহারুল ইসলাম
সুজাপুর, ফুলবাড়ী
দিনাজপুর।

উত্তরঃ কবরের উপরে মসজিদ নির্মাণ করা বৈধ নয়। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, '...ঐ সব (হাবশাবাসী) লোকদের মধ্য হ'তে কোন সৎ ব্যক্তি মারা গেলে তারা তার কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করত এবং তাদের চিত্র নির্মাণ করে মসজিদের মধ্যে রাখত। ঐসব লোক আল্লাহ্র নিকট অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও জঘন্য' *(মুসলিম ১/২০১ 'কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ' অনুচ্ছেদ)*। জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কবরকে পাকা করতে, তার উপরে ঘর নির্মাণ করতে, তার উপরে বসতে ও নাম লিখে রাখতে নিষেধ করেছেন' *(মুসলিম, ইরওয়াউল গালীল হা/৭৫৭, ৩/২০৭ পৃঃ)*।

পুরাতন মসজিদ সংস্কারের সময় মেহরাব ও কাতার ঠিক রাখতে হবে এবং সেখানে ওযূ খানা তৈরি করা যাবে না কথাগুলি ভিত্তিহীন। কারণ যেখানে মসজিদের স্থান পরিবর্তন করা শরী'আত সম্মত, সেখানে মেহরাব ও কাতার ঠিক রাখার কোন প্রশ্নই আসে না। ওমর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে কুফার মসজিদকে স্থানান্তরিত করে সেখানে খেজুরের বাজার করা হয়েছিল *(ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়াহ ৩১/২১৭ পৃঃ)*। পুরুষদের সাথে একটু দূরে পৃথক কামরায় মহিলাদের ছালাত আদায় করা জায়েয হবে *(ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, পৃঃ ৩১১)*।

প্রশ্নঃ (১৬/১৭৬)ঃ জনৈক মুফতী ছাহেব ছহীহ হাদীছের হাওয়ালা দিয়ে বলেন, যারা ফজরের সুন্নাত ফরয ছালাতের পূর্বে পড়তে না পারবে, তাদেরকে সূর্যোদয়ের পরে পড়তে হবে। বিষয়টি যথাযথভাবে জানানোর জন্য অনুরোধ রইল।

-আব্দুস সালাম
কাটিয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ফজরের ফরয ছালাতের পর সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের সুন্নাত পড়া যাবে না মর্মে মুফতী ছাহেবের উক্ত কথা সঠিক নয়। ক্বায়েস ইবনে ওমর (রাঃ) একদা ফজরের ছালাত আদায় করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ছালাতরত অবস্থায় পেলেন। ফলে তিনি ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত না পড়েই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে জামা'আতে ফরয ছালাত আদায় করলেন। ছালাত শেষ হওয়ার পর পরই তিনি ফজরের সুন্নাত পড়ার জন্য দাঁড়ালেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, এটা কোন্ ছালাত? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার জবাব শুনে চুপ থাকলেন, কিছু বললেন না' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ, ইবনু খুযায়মা, ইবনু হিব্বান, সনদ হাসান, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৪০)*। কাজেই ফজরের পর পরই এটা পড়া উত্তম। তবে সূর্যোদয়ের পরেও পড়া জায়েয আছে *(নায়ল ৩/২৮)*।

প্রশ্নঃ (১৭/১৭৭)ঃ এ.টি.এন বাংলা চ্যানেলে শুনলাম ব্যবহারিক গয়নার যাকাত নেই। একথা সত্য কি?

-আযাদ
উপযেলা মেডিক্যাল সেন্টার
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ ব্যবহারিক গহনার স্বর্ণ নেছাব পরিমাণ হ'লে তাতে যাকাত দিতে হবে। উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, আমি সোনার গয়না পরিধান করতাম। একদা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! ব্যবহৃত গয়না কি সঞ্চিত ধন? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'নেছাব পরিমাণ হ'লে এবং তাতে যাকাত দেওয়া হ'লে তা সঞ্চিত ধন নয়' *(আবুদাঊদ, মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৮১০ ছহীহ আবুদাঊদ হা/১৩৮৩, 'যাকাত' অধ্যায়; মুগনী ৪/২২৩ পৃঃ মাসআলা নং ৪৫০; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৩০ পৃঃ)*। ইবনু মাস'ঊদের স্ত্রী যায়নাব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে বলেন, 'হে নারী সমাজ! তোমরা ছাদাক্বা কর, যদিও সেটা তোমাদের ব্যবহৃত গয়না হৌক। কেননা ক্বিয়ামতের দিন তোমাদের অধিকাংশ জাহান্নামী হবে' *(ছহীহ তিরমিযী হা/৫১৭; মিশকাত হা/১৮০৮)*।

প্রশ্নঃ (১৮/১৭৮)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'ওয়ায়েস ক্বরনী'কে জামা দান করেছিলেন এবং তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মহব্বতে তাঁর বত্রিশটি দাঁত ভেঙ্গে ছিলেন। এসব কথা কি সত্য? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-রফীকুল ইসলাম
কাতলাসেন, ময়মনসিংহ।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'ওয়ায়েস কুরনী'কে জামা দান করেছিলেন একথা সত্য নয় এবং তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মহব্বতে বত্রিশটি দাঁত ভেঙ্গে ছিলেন মর্মেও কোন প্রমাণ নেই। কারো মহব্বতে দাঁত ভেঙ্গে ফেলাও জায়েয নয়। কারণ এত সৃষ্টির পরিবর্তন ঘটে, যা হারাম। যারা সৃষ্টির পরিবর্তন ঘটায় তাদের প্রতি আল্লাহ লা'নত করেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৩১, 'পোষাক' অধ্যায়, 'চুল আঁচড়ানো' অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখ্য যে, এই উম্মতের মধ্যে শুধুমাত্র ওয়ায়েস কুরনীকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খলীল বা দোস্ত বলেছেন মর্মে যে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে, সেটি 'জাল' *(সিলসিলা যঈফা হা/১৭০৭)*।

প্রশ্নঃ (১৯/১৭৯)ঃ ফিৎরা বা কুরবানীর চামড়ার টাকা দিয়ে সামাজিক ও ধর্মীয় কাজের জন্য সামিয়ানা তৈরি করা যাবে কি?

-মুত্ত্বালেব
তালশন, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ ফিৎরা বা কুরবানীর চামড়ার টাকা দ্বারা সামাজিক ও ধর্মীয় কাজের জন্য সামিয়ানা তৈরি করা যাবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা যাকাতের জন্য যেসব খাত উল্লেখ করেছেন এটা তার অন্তর্ভুক্ত নয়। এমনকি উক্ত টাকা দ্বারা মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফনের ব্যবস্থাও করা যাবে না *(মুগনী ৪/১২৫ পৃঃ)*। একদা ইমাম আহমাদ (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, যাকাত হ'তে মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করা যাবে কি? এবং তার কাফন-দাফন করা যাবে কি? জবাবে তিনি বলেছিলেন, না' *(মুগনী ৪/১২৬, মাসআলা নং ৪৩১)*।

প্রশ্নঃ (২০/১৮০)ঃ পায়ে নূপুর পরা যায় কি? অনেকে বলেন, পায়ে নূপুর পরা ইহুদীদের চলন। বিষয়টি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-শারমিন আখতার
বেনীচক, গোমস্তাপুর
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ পায়ে নূপুর পরা যাবে না। কারণ নূপুর পরলে এমন শব্দ হয় যাকে ঘন্টার সাথে তুলনা করা হয়েছে। একদা এক মেয়ে টুন টুন বাজনা সম্পন্ন ঝুমুর পরে আয়েশা (রাঃ)-এর নিকটে আসলে আয়েশা (রাঃ) ঝুমুর খুলে ফেলা পর্যন্ত তাকে ভিতরে প্রবেশ করতে নিষেধ করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি 'যেখানে ঘন্টা থাকে সেখানে ফেরেশতা আসে না' *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩৫৬০; ছহীহ নাসাঈ হা/৪৮১৫-১৮; মিশকাত হা/৪৩৯৯ 'আংটি' অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখ্য যে, শব্দবিহীন নূপুর পরিধানে কোন দোষ নেই।

প্রশ্নঃ (২১/১৮১)ঃ দুই তলা বিশিষ্ট একটি দালানের প্রথম তলা হচ্ছে সিনেমা হল, আর দ্বিতীয় তলা মসজিদ। এমন মসজিদ জায়েয হবে কি?

-আমীনুল ইসলাম
মাহমূদপুর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ মসজিদ ইবাদতের জন্য যেমন ওয়াক্ফ থাকতে হবে, তেমনি সেটার পরিবেশও পবিত্র থাকতে হবে। নীচে সিনেমা হল রেখে উপরে মসজিদ করা নিঃসন্দেহে একটি অবৈধ কাজ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কা'বা গৃহে ছালাত আদায়ের সময় ছালাতে অমনোযোগী করার জন্য কুরায়েশরা গোলমাল ও শব্দ করত *(হা-মীম সাজদাহ ২৬)*। এতদ্ব্যতীত তারা তালি বাজাতো ও শিস দিত *(আনফাল ৩৫)*। বাজনা থেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কানে আঙ্গুল দিয়ে সেখান থেকে সরে যেতেন। ছাহাবীগণও অনুরূপ করতেন *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৪১১৬ 'শিষ্টাচার' অধ্যায় 'গান-বাজনা মকরূহ' অনুচ্ছেদ)*। অতএব সিনেমা হলের পবিত্র পরিবেশে মসজিদ করা কখনোই ঠিক হবে না।

প্রশ্নঃ (২২/১৮২)ঃ মৃত ব্যক্তিকে দাফন না করা পর্যন্ত পরিবারের সকল সদস্যকে না খেয়ে থাকতে হবে, একথাটি কি ঠিক?

-ইউনুস রহমান
মুশরিভুজা, ভোলাহাট
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ঠিক নয় বরং এগুলি জাহেলী প্রথা। জা'ফর বিন আবু ত্বালিব (রাঃ)-এর শহীদ হওয়ার সংবাদ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে পৌঁছার পরপরই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার পরিবারের জন্য অন্যদেরকে খাদ্য তৈরি করতে বলেন, অথচ তখন তাঁর কাফন-দাফন হয়নি' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, নায়ল ৪/১০৪ পৃঃ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৬১ পৃঃ; মিশকাত হা/১৭৩৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর তিন দিন যাবত তাঁর লাশ দাফন করা হয়নি *(আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ৪৭১)*। অথচ তাঁর পরিবার তিন দিন না খেয়ে ছিলেন এমন কোন প্রমাণ নেই।

প্রশ্নঃ (২৩/১৮৩)ঃ ছালাত চলা অবস্থায় আগন্তুক ব্যক্তি মুছল্লীদের সালাম দিতে পারে কি?

-ছাদেকুল ইসলাম
চৌডালা, গোমস্তাপুর
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত অবস্থায় মসজিদে প্রবেশকারী ব্যক্তি মুছল্লীদের সালাম দিতে পারে। এ সময়ে মুছল্লীগণ মুখে উচ্চারণ করে সালামের উত্তর না দিয়ে বরং হাতের ইশারায় উত্তর দিবে। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমি বেলাল (রাঃ)-কে বললাম, ছালাত অবস্থায় মুছল্লীগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সালাম দিলে তিনি কিভাবে উত্তর দিতেন। বেলাল (রাঃ) বললেন, হাতের ইশারায় উত্তর দিতেন *(নাসাঈ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৯৯১ সনদ হাসান)*। নাফে' (রাঃ) বলেন, একদা ইবনু ওমর (রাঃ) এক মুছল্লীর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সালাম দিলেন,

মুছল্লী মুখে উচ্চারণ করে উত্তর দিল। তিনি তার নিকট ফিরে গিয়ে বললেন, তোমাদের কারো প্রতি ছালাত অবস্থায় সালাম দিলে মুখে উচ্চারণ করে উত্তর দিবে না। হাতের ইশারায় উত্তর দিবে *(মুওয়াত্ত্বা মালেক, মিশকাত হা/১০১৩ সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্নঃ (২৪/১৮৪)ঃ আমার পিতা বিদ'আতী কাজের মাধ্যমে আমাকে অর্থ উপার্জন করতে বলেন। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
গোপালপুর, চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তরঃ বিদ'আতী কাজের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা হারাম। আর হারাম কাজে পিতা-মাতার আদেশ পালন করা যাবে না। নাওয়াস ইবনে সাম'আন (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির প্রতি কোন আনুগত্য নেই' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/৩৬৬৪ ও ৩৬৯৬ 'নেতৃত্ব ও বিচার' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২৫/১৮৫)ঃ ডিপোজিট পেনশন স্কীমে আমার কিছু টাকা জমা আছে। মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত মুনাফা পাব না। এখন আমাকে মূল টাকার যাকাত দিতে হবে, নাকি মূল ও লাভ সমষ্টির যাকাত দিতে হবে?

-আব্দুল হামীদ
হেলেনাবাদ, রাজশাহী।

উত্তরঃ যেহেতু এই টাকা ব্যবসা মূলক রয়েছে। কাজেই প্রতি বছর মূল টাকা ও লাভের টাকা হিসাব করে যাকাত বের করতে হবে। সামুরা বিন জুনদব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে ব্যবসার সম্পদ হিসাব করে যাকাত বের করতে বলেছেন' *(আবুদাঊদ, বুলূগুল মারাম হা/৬০৯ 'যাকাত' অধ্যায়, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৩২ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৬/১৮৬)ঃ যৌতুক নিয়ে বিবাহ করলে কি স্বামী-স্ত্রীর মেলামেশা অবৈধ হবে?

-রাফিয়া খাতুন
মহেশপুর, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।

উত্তরঃ যৌতুক নিয়ে বিবাহ করলে স্বামী-স্ত্রীর মেলামেশা অবৈধ হবে না। কারণ যৌতুক একটি হারাম কাজ, তা বৈধ বিবাহের কোন ক্ষতি করতে পারে না। উল্লেখ্য যে, যৌতুক গ্রহণ করা হারাম। আল্লাহ তা'আলা যেখানে মোহরানার বিনিময়ে বিবাহ করতে বলেছেন *(নিসা ২৩)*, সেখানে উল্টা স্ত্রীর নিকট থেকে অর্থ গ্রহণ করা আল্লাহ্র হুকুমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল। মুসলমান ছেলেদের এ বিষয়ে কঠোর হওয়া উচিত।

প্রশ্নঃ (২৭/১৮৭)ঃ মসজিদের টাকা ব্যাংকে রেখে সে টাকা দিয়ে ইমামের বেতন দেওয়া যাবে কি?

-শফীকুর রহমান
নামুড়ি, আদিতমারী
লালমণিরহাট।

উত্তরঃ মসজিদের টাকা ব্যাংকে রেখে ইমামের বেতন দেওয়া যাবে। তবে টাকা যে কোন ইসলামী ব্যাংকে রাখতে হবে অথবা সূদমুক্ত অবস্থায় রাখতে হবে। কারণ সূদ যেমন কোন মুসলমানের জন্য গ্রহণ করা বৈধ নয়, তেমনি ইমামের জন্যও গ্রহণ করা বৈধ নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূদ দাতা, সূদ গ্রহীতা, সূদের লেখক ও সূদের সাক্ষীদ্বয়ের প্রতি লা'নত করেছেন এবং বলেছেন তারা সকলেই সমান' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮০৭ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায় 'সূদ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৮/১৮৮)ঃ গাছ-পালা ও যমীনকে সাক্ষী রেখে বিয়ে করা কি জায়েয হবে?

-আব্দুছ ছামাদ
চৌডালা, গোমস্তাপুর
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ এ ধরনের বিবাহ জায়েয নয়, কেউ করলে তা বাতিল হবে। কারণ বিবাহ বৈধ হওয়ার জন্য একজন ওয়ালী ও দু'জন সাক্ষী অপরিহার্য *(নায়ল ৬/১২৬ পৃঃ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/১৯৭ পৃঃ)*। বিবাহ মুসলিম জীবনে ঈমানের মাপকাঠি। এটা নিয়ে এ ধরনের খেল-তামাশা করার বিরুদ্ধে কঠোর সামাজিক শাসন ও রাষ্ট্রীয়ভাবে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া যরূরী।

প্রশ্নঃ (২৯/১৮৯)ঃ ডান পায়ে অসুখ হওয়ার কারণে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করলে ছালাত হবে কি?

-মনছূর আলী
হরিরামপুর, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ছালাতে বসতে অসুবিধা হ'লে দাঁড়িয়ে থেকে আদায় করলে ছালাত হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন 'তোমরা তোমাদের সাধ্যানুযায়ী আল্লাহকে ভয় কর' *(তাগাবুন ১৬)*। পীড়িত ব্যক্তি সক্ষম হ'লে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করবে। নচেৎ বসে অথবা শুয়ে বা কাত হয়ে বা ইশারা করে ছালাত আদায় করবে। অথবা তার সুবিধা মত ছালাত আদায় করবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ, 'পীড়িত ব্যক্তির ছালাত' অনুচ্ছেদ ১/২৬০, ২৬১ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩০/১৯০)ঃ এক খণ্ড জমি দুই ব্যক্তির নিকট বিক্রি করলে উক্ত জমি কোন ব্যক্তি পাবে?

-আব্দুল বারী
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ ১ম ব্যক্তি উক্ত জমি পাবে। সামুরা বিন জুনদুব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে নারীকে দুই ওয়ালী দুই ব্যক্তির নিকট বিবাহ দিয়েছে, সে প্রথম ব্যক্তির হবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি দু'জনের নিকট কোন মাল বিক্রয় করেছে, সে মাল প্রথম জনের হবে' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ, দারেমী, মিশকাত হা/৩১৫৬ 'বিবাহের ঘোষণা, খুৎবা ও শর্তাবলী' অনুচ্ছেদ, বাংলা মিশকাত হা/৩০২১)*।

হাদীছটিকে তিরমিযী, আবু যুর'আ ও আবু হাতেম 'হাসান' বলেছেন। হাকেম একে বুখারীর শর্ত অনুযায়ী 'ছহীহ' বলেছেন এবং যাহাবী তাকে সমর্থন করেছেন। তবে আলবানী বলেন, হাদীছটি যঈফ *(ইরওয়াউল গালীল হা/১৮৫৩, ৬/২৫৪ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩১/১৯১)ঃ জান্নাতে কি যৌবন লোপ পাবে? না সর্বদা যুবক অবস্থায় থাকবে?

-মিছবাহুল ইসলাম
মোলামগাড়ীহাট, কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ জান্নাতে যৌবন কখনোই নিঃশেষ হবে না। বরং সর্বদা যুবক অবস্থায় থাকবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে তথায় সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে আরাম-আয়েশের মধ্যে ডুবে থাকবে। কোন প্রকারের দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা তাকে স্পর্শ করবে না এবং তার পোষাক-পরিচ্ছদ ময়লা বা পুরাতন হবে না এবং তার যৌবনও নিঃশেষ হবে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬২১ 'ক্বিয়ামতের অবস্থা' অধ্যায় 'জান্নাত ও জান্নাতবাসীদের বিবরণ' অনুচ্ছেদ; বাংলা মিশকাত হা/৫৩৮০, ১০ম খণ্ড)*।

প্রশ্নঃ (৩২/১৯২)ঃ ক্বিয়ামতের দিন শুধু ভাল আমল সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে অবহিত করে ফায়ছালা করবেন? নাকি খারাপ কাজের জন্যও বিচার করবেন?

-আব্দুল কুদ্দুস
বান্দাইখাড়া, আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা মুমিন বান্দার কিছু পাপ ঢেকে রেখে সে পাপ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করবেন এবং সে ঐ পাপ সমূহের স্বীকৃতি প্রদান করবে। তখন সে বান্দা ধারণা করবে যে, ঐ পাপের কারণেই সে ধ্বংস হবে। অতঃপর নেকীর আমলনামা দেওয়া হবে এবং ঐ অপরাধ সমূহ আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন। অতঃপর কাফির ও মুনাফিকদেরকে সকল সৃষ্টিকুলের সম্মুখে বলা হবে 'এরাই হ'ল ঐসব লোক, যারা তাদের পালনকর্তাকে মিথ্যা মনে করেছিল। জেনে রাখঃ সীমালংঘণকারীদের উপরে আল্লাহ্‌র লা'নত' *(হূদ ১৮; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৫১; বাংলা মিশকাত হা/৫৩১৭)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ক্বিয়ামতের দিন যার হিসাব নেওয়া হবে, সে অবশ্যই ধ্বংস হবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৪৯ 'হিসাব-নিকাশ' অধ্যায় 'প্রতিশোধ গ্রহণ ও মীযানের বর্ণনা' অনুচ্ছেদ; বাংলা মিশকাত হা/৫৩১৫, ১০ম খণ্ড)*। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা ভাল-মন্দের হিসাব অবহিত করেই ফায়ছালা করবেন।

প্রশ্নঃ (৩৩/১৯৩)ঃ দাস বা গোলাম নাকি আল্লাহ্‌র নিকটে দ্বিগুণ নেকী পাবে? এ কথার সত্যতা জানতে চাই।

-সবুজ ও নাঈম
বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ যে গোলাম আল্লাহ এবং তার মালিকের হক যথাযথভাবে আঞ্জাম দেওয়া অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, তার জীবন সার্থক। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'সেই গোলামের জন্য কতই না সৌভাগ্য আল্লাহ তা'আলা যাকে নিজের মালিকের খেদমত এবং আল্লাহ্‌র ইবাদত করা অবস্থায় মৃত্যু দান করেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৩৪৯ 'স্ত্রী ও সন্তানের খোর-পোষ এবং দাস-দাসীর অধিকার' অনুচ্ছেদ; বাংলা মিশকাত হা/৩২০৬, ৬ষ্ঠ খণ্ড)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন 'গোলাম বা দাস যখন নিজের মালিকের মঙ্গল কামনা করে এবং উত্তম রূপে আল্লাহ্‌র ইবাদত করে, সে দ্বিগুণ নেকীর অধিকারী হয়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৩৪৮)*। সুতরাং আল্লাহ্‌র ইবাদত যথাযথভাবে সম্পাদন করার সাথে সাথে মনিবের হক পূর্ণভাবে আদায় করলে দ্বিগুণ নেকী পাবে ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্নঃ (৩৪/১৯৪)ঃ মোটা মোযা ছাড়া নাকি মাসাহ করা যাবে না? কোন্ মোযার উপর মাসাহ চলবে এবং কয়দিন চলবে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ইমাদাদুল হক
মালিটোলা (বংশাল এলাকা)
ঢাকা-১১০০।

উত্তরঃ মোটা মোযা হৌক বা পাতলা মোযা হৌক যেকোন মোযার উপর মাসাহ করা যাবে *(আহমাদ, তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৫২৩, মির'আত হা/৫১৯-এর ব্যাখ্যা, ২/২১২ পৃঃ, 'মোযার উপরে মাসাহ' অনুচ্ছেদ)*। নিয়ম হচ্ছে ওযূ করে পায়ে মোযা পরতে হবে। অতঃপর নতুন ওযূর সময় মোযার উপরিভাগে হাতের ভিজা আঙ্গুল দ্বারা পায়ের উপরের পাতা হ'তে টাখনু পর্যন্ত টেনে এনে একবার মাসাহ করবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৮)*। মুক্বীম অবস্থায় ১ দিন ১ রাত ও মুসাফির অবস্থায় ৩ দিন ৩ রাত একটানা মোযার উপরে মাসাহ করা যাবে' *(মুসলিম, নাসাঈ, মিশকাত হা/৫১৭, ৫২০)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/১৯৫)ঃ আমরা দুই বন্ধু চট্টগ্রামের এক পাহাড়ে অবস্থান করছিলাম। খাদ্য ও টাকা পয়সা নিকটে না থাকায় নিরুপায় হয়ে ক্ষুধার তাড়নায় সাপ ধরে ভূনা করে খেয়ে ফেলেছি। এতে কি আমাদের কোন পাপ হবে?

-ছাব্বির ও সোহাগ
বড়িয়াহাট, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তরঃ হারাম বস্তু ভক্ষণ হ'তে সর্বদা বেঁচে থাকতে হবে, এটিই শরী'আতের নির্দেশ। প্রশ্নে বর্ণিত বিবরণ যদি সত্য হয়, তবে উক্ত অবস্থায় সাপ খাওয়া জায়েয হয়েছে এবং এতে কোন পাপ হবে না। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'কোন বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন ছাড়া বাধ্যগত অবস্থায় (হারাম খাদ্য) খেলে কোন পাপ নেই' *(বাক্বারাহ ১৭৩)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/১৯৬)ঃ সন্তান-সন্ততি জন্মের সময় চিৎকারের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে জনৈক আলেম বলেন, মাতৃগর্ভের গরম হ'তে হঠাৎ পৃথিবীর ঠাণ্ডায় আসার জন্য ক্রন্দন করে। আমরা শুনেছি শয়তানকে দেখে কাঁদে। কোন্‌টি সঠিক? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-জাবেদ ইকবাল
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ একাধিক ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, এটি শয়তানের স্পর্শ বা খোঁচার কারণে হয়ে থাকে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, মারিয়াম ও তার সন্তান ঈসা (আঃ) ব্যতীত প্রত্যেক বনু আদমই প্রসবকালে শয়তানের স্পর্শে চিৎকার করে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৯ 'ঈমান' অধ্যায়; বাংলা মিশকাত হা/৬৩)*। অন্য হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন 'প্রসবকালে শিশুর চিৎকার শয়তানের খোঁচার কারণে হয়ে থাকে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭০)*। শয়তানকে দেখে শিশু চিৎকার দেয় সেটাও ঠিক নয়।

প্রশ্নঃ (৩৭/১৯৭)ঃ পরনিন্দা বা গীবত করলে ওযূ ও ছিয়াম নষ্ট হবে কি?

-আব্দুশ শুকুর
বারকোণা, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি মওযূ বা জাল। যেমন- আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'পাঁচটি কর্ম ছিয়াম ও ওযূকে নষ্ট করে দেয়। (১) মিথ্যা (২) গীবত বা পরনিন্দা (৩) চোগলখুরী (অর্থাৎ একের কথা অন্যকে লাগিয়ে দু'জনের মধ্যে ঝগড়া বাঁধিয়ে নিজে ভাল থাকা) (৪) যৌনাকাংখা নিয়ে অন্যের দিকে তাকানো (৫) মিথ্যা কসম করা' *(সিলসিলা যঈফা হা/১৭০৮)*। গীবত বা পরনিন্দা করা শরী'আতে নিষিদ্ধ। কিন্তু তাতে ওযূ বা ছিয়াম নষ্ট হবে কথাটি সঠিক নয়।

প্রশ্নঃ (৩৮/১৯৮)ঃ হায়েয ও ইস্তেহাযা উভয়টির হুকুম পার্থক্য করে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ রইল।

-এস, খাতুন
শুকদেবপুর, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ নিয়মিত মাসিককে 'হায়েয' বলে। আর মাসিকের বাইরে অথবা প্রসবান্তে নেফাসের ৪০ দিন পরেও রক্তস্রাব দেখা দিলে তাকে 'এস্তেহাযা' বলে। শেষেরটি রোগের মধ্যে শামিল। উভয়ের হুকুম হ'ল, মাসিক হ'লে ছালাত ও ছিয়াম হ'তে বিরত থাকবে। ছিয়াম ক্বাযা করতে হবে কিন্তু ছালাত মাফ। মাসিকের নির্দিষ্ট সময় শেষ হ'লে তারপরও যদি রক্ত প্রবাহিত হ'তে থাকে অথবা প্রসবের ৪০ দিন পর রক্ত প্রবাহিত হ'তে থাকে, তবে গোসল করে প্রত্যেক ছালাতের সময় ওযূ করে ছালাত আদায় করবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, ফাতেমা বিনতে আবু হুবাইশ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমি এমন একজন স্ত্রীলোক, যে সর্বদা এস্তেহাযা রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকি এবং পাক হই না। আমি কি ছালাত ছেড়ে দিব? তিনি বললেন, না, এটি একটি শিরার রক্ত, মাসিক নয়। যখন তোমার মাসিক হবে, তখন ছালাত ছেড়ে দিবে। আর যখন মাসিকের নির্দিষ্ট সময় শেষ হয়ে যাবে, তখন তুমি গোসল করে নিবে। অতঃপর ছালাত আদায় করতে থাকবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৭ 'পবিত্রতা' অধ্যায়, 'ইস্তেহাযা' অনুচ্ছেদ; বাংলা মিশকাত ২য় খণ্ড, হা/৫১২)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/১৯৯)ঃ বাংলা মিশকাত ৮ম খণ্ডের ১৭৮ পৃঃ ৪০৭৬ নং হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজের পিতার কসম খেয়েছেন। তাহ'লে আমরা বাপ-মার কসম কেন খেতে পারব না?

-আব্দুল ওয়াদূদ
কালীগঞ্জ হাট কলেজ
তানোর, রাজশাহী।

উত্তরঃ উল্লিখিত হাদীছটি 'যঈফ' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪২৬১ 'খাদ্য' অধ্যায় 'বাধ্যগত অবস্থায় খাওয়া' অনুচ্ছেদ)*। বর্ণনাকারীদের মধ্যে উক্ববা বিন ওয়াহাব নামক জনৈক ব্যক্তি রয়েছে। যাহাবী বলেন, সে অপরিচিত এবং তার বর্ণিত খবর সঠিক নয়' *(ইবনু হাজার আসক্বালানী, হেদায়াতুর রুওয়াত শরহ মিশকাত হা/৪১৯০-এর টীকা; আলবানী, যঈফ আবুদাঊদ হা/৩৮১৭)*। উপরন্তু হাদীছটি বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত ছহীহ হাদীছের বিরোধী। যেমন- ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেছেন তোমাদের পিতা-মাতার নামে কসম করতে। অতএব যে ব্যক্তি কসম করতে চায়, সে যেন আল্লাহ্‌র নামে কসম করে অথবা চুপ থাকে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৪০৭ 'শপথ ও মানত' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৪০/২০০)ঃ বাঘের গোশত খাওয়া যে হারাম তার দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আলমগীর
দক্ষিণ দনিয়া, নয়াপাড়া
ডেমরা, ঢাকা-১২৩৬।

উত্তরঃ বাঘ হিংস্র জন্তু। সেকারণ তার গোশত খাওয়া হারাম। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তীক্ষ্ণ দন্তধারী হিংস্র জন্তু খাওয়া হারাম' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪১০৪ 'যে প্রাণী খাওয়া হালাল ও যা হারাম' অনুচ্ছেদ; বাংলা মিশকাত হা/৩৯২৬, ৮ম খণ্ড)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'দন্ত তীক্ষ্ণ হিংস্র জন্তু এবং ধারাল নখরবিশিষ্ট হিংস্র পাখি খেতে নিষেধ করেছেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪১০৫, বাংলা মিশকাত হা/৩৯২৭)*।